জলাতঙ্ক : সংস্কার ও সমস্যা

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ মিশ্র

জলাতঙ্ক ঃ সংস্কার ও সমস্যা

২৪

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ মিশ্র

মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪ নং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

JALATANKA : SANSKAR-O-SAMASYA

By—Dr. Rabindranath Misra

প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৮৭

প্রকাশক : সুধীর কুমার মণ্ডল
১৪ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : পনের টাকা মাত্র

মুদ্রক : শ্রীমতী অর্চনা ঘোষ
৯এ হরিপাল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

নিবেদন

আমার চেনা চৌহদ্দির কয়েকজনের জলাতঙ্কে মৃত্যু আমাকে এ ব্যাপারে ভাবিয়ে তোলে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষদশকেও অশিক্ষিত মানুষতো বটেই অনেক শিক্ষিত মানুষেরও এই রোগে ওঝাতন্ত্রে আত্মসমর্পণ স্বাভাবিক ভাবেই শঙ্কিত করে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। অন্ধবিশ্বাস ও মন্ত্রতন্ত্রে আস্থাস্থাপন এদেশের মানুষের জন্মগত প্রকৃতি। তাই বিশেষ করে গ্রামের লোকেরা সাপ বা কুকুরে কামড়ালে আগে ওঝা ডাকে—জীবনমরণ নির্ভর করে ওঝার ফুসমন্তরের ওপর। ওঝারা সকলেই যে প্রতারক, মানুষের জীবনকে বাজি রাখেন ব্যবসায়িক স্বার্থে তা কিন্তু নয়, আসলে এর পেছনেওআছে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা। ওঝারাও এই অজ্ঞতার কারণে তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতিকে সঠিক বলেই বিশ্বাস করেন। ওঝাদের চিকিৎসা পদ্ধতির ভিত্তি যে অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাস তা তুলে ধরার জন্য ঐরকম কয়েক-জনের চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছি। ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ নয় বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে তাঁদের অবলম্বিত অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার। এই রোগের বিজ্ঞান জানা থাকলে তাঁরাও হয়তো ঝাড়ফুকের চিকিৎসা পরিত্যাগ করতেন।

প্রসঙ্গক্রমে রোগজীবাণু ভাইরাসের আলোচনা করা হয়েছে, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হয়েছে প্রতিষেধক আবিষ্কারকের কথা। আলোচনাক্রমে এসে গেছে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতিতে কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসার ব্যাপারস্যাপারগুলো। এই পর্যায়ের শিরোনামে—'স্ববিরোধিতা' কথাটি ভুলক্রমে লেখা হয়ে গেছে। ভ্যাকসিনের আলোচনার নতুন নতুন আবিষ্কার এর কথা যতটা সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পরবর্তী দিনে একে আরো পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়ার ইচ্ছা থাকল।

বিশেষ পরিচিত মেদিনীপুর জেলার রামনগরের যুবক অভিমন্যু জানার জলাতঙ্কে অকালমৃত্যু ঐ অঞ্চলে শোকের ছায়া ফেলেছিল।

আমিও বিশেষ নাড়া খেয়েছিলাম ওঝার মন্ত্রে অভিমন্যুর আত্মসমর্পণে। তার মৃত্যুর পেছনে যে ভুল ছিল তা ঐ অঞ্চলের বিশ্বাসীমনে তেমন নাড়া দিতে পারেনি। যে ভ্রান্ত পদ্ধতি "বিষ নামানোর, নামে তার জীবনের গোড়ায় বিষ ঢেলে দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করার নৈতিক দায়িত্ব এড়াতে পারিনি। এই অভিমন্যুকে দিয়েই বই-এর শুরু—এই প্রয়াস রোগকে ঘিরে ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসের পুরনো প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে এমন দাবী করব না। তবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বা 'উৎস মানুষ' ইত্যাদি পত্রিকা গোষ্ঠী, আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগ সচেতন ভাবে যে প্রয়াস চালাচ্ছেন সেই আন্দোলনের মিছিলে এটি ঠাঁই পেতে পারলে শ্রম সার্থক হবে।

বন্ধু শঙ্কর মণ্ডল যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কলকাতার পাস্তুর ইনস্টিটিউটের ডাঃ সুধাংশু কুমার মণ্ডল, বন্ধু ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু, আমার অনুজ ডাঃ অলোক মিশ্র নানা ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। স্নেহাস্পদ প্রশান্ত পানির অন্তরঙ্গ সহযোগিতা ও আমার স্ত্রী অঞ্জনা মিশ্রের প্রেরণা ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হোতো না। এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। কোলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্য ছাপার ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা থেকে যায়—জয়ন্ত প্রেসের কর্মীবন্ধুরা যথেষ্ট ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

৬ই জুলাই ১৯৮৭ রবীন্দ্রনাথ মিশ্র

"Science and peace must triumph over ignorance and war, that nations will unite not to destroy but to instruct one another, and that the future will belong to those who have done most for suffering humanity".

Louis Pasteur

বিষয় সূচী

১। আদিকথা—রোগজীবাণু, প্রতিষেধক ... ১

২। রোগ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী একজীবন—লুই পাস্তুর ... ৯

৩। জীবননাশী জলাতঙ্ক ... ১৭

ভাইরাস, কিভাবে রোগ ছড়ায়, পাগলা কুকুর চিনতে হলে, জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষের রোগ লক্ষণ, কিছু ভ্রান্ত ধারণা।

৪। জীবননাশী রোগে সর্বনাশী ওঝাতন্ত্র ... ৩৬

পিঠে থালা বসানো, প্রস্রাবে তেল দিয়ে দেখা ইত্যাদি।

৫। বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতিতে জলাতঙ্ক ... ৫১

৬। বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা ... ৫৯

অ্যান্টির‍্যাবিজ ভ্যাকসিন, প্রাথমিক চিকিৎসা, ভ্যাকসিনের ডোজ, ভ্যাকসিনের চাহিদা, ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়া।

৭। ভ্যাকসিন—নবতর সংযোজন ... ৮৮

সেল কালচার ভ্যাকসিন (H C.D.S.)
Rabipur

৮। নির্মূল হোক এই রোগ ... ৯৫

৯। আপনার আদরের কুকুর কতটা নিরাপদ ... ১০১

পোষা কুকুরের জন্য ভ্যাকসিন

১০। ভ্রান্তধারণা ও কিছু প্রশ্ন ... ১০৩

১১। অবহেলার আর এক নাম মৃত্যু ... ১০৯

শ্রীচরণেষু মা কে—

গ্রন্থপঞ্জী

1. Encyclopaedia Britanica.
2. Preventive and social medicine—Park & Park.
3. History of Medicine—Douglas Guthrie.
4. The Tribal world—Verrier Elwin
5. Text book of Medicine—Davidson
6. Pathology—N. C. Dey.
7. Medical microbiology—mackie Mc Cartney—vol.-1
8. Guiness book of records.
9. আনন্দবাজার পত্রিকা—২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৪ ও ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৬।
10. দেশ—১২ই এপ্রিল ১৯৮৬
11. Science To day. —July 1985
12. Journal of the Indian Medical Association (JIMA) volume—April 1981 & September 1983
13. Manson's tropical disease
14. Traditional chinese Medicine & pharmacology.
15. কবিরাজী শিক্ষা—কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন।
16. দ্রব্যগুণ—কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
17. চিরঞ্জীব বনৌষধি—আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য।
18. আয়ুর্বেদ শিক্ষা—কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত।

একটি সন্দেহজনক কুকুর

ওঝাদের 'রোগ নির্ণয়ের' পদ্ধতি
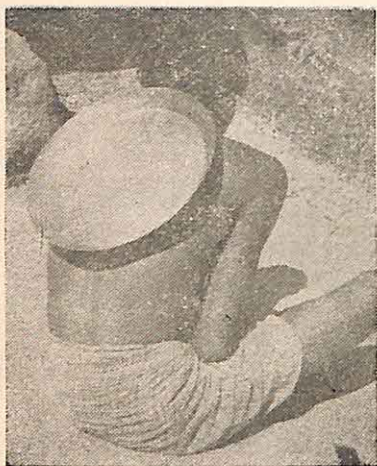
ছবি দুটি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের।
কোন মন্ত্র নয় এমনিতেই বসে আছে কাঁসার থালা।

আদি কথা—রোগ জীবাণু—প্রতিষেধক

অভিমন্যুকে দেখে কৈশোরে পড়া সেই হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার কথা মনে পড়ত। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা ছিল গল্পের নায়ক আর গল্পের চাবি ছিল গল্পকারের হাতে। বাঁশিওয়ালা তাই জিতে গিয়েছিল ইঁদুরদের সঙ্গে তার কেরামতিতে। কিন্তু আমার অভিমন্যু পারে নি। তার শখ তার খেলা তাকে মৃত্যু উপহার দিয়েছে।

ব্যাপারটা এই—রামনগরের হরবোলা অভিমন্যু জানা বিভিন্ন পশু পাখির ডাক নিখুঁত নকল করতে পারত। প্রত্যেকদিন সকালে সে কুকুরের ডাক ডেকে অনেক কুকুর জড়ো করত আর তাদের দিত সস্তাদামের আটার বিস্কুট। এই অতিথি কুকুরদের একটি একদিন অভিমন্যুর হাতে দাঁত বসিয়ে তার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন এঁকে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পেট মোটা পানদোকানি অভিমন্যুকে উপদেশ দিল সোলেমানপুর গ্রামের সুরেন ওঝার কাছে যাওয়ার জন্য। অভিমন্যু তাই করল। ওঝা তার পিঠে মন্ত্রপূত কাঁসার থালা বসিয়ে রোগ নির্ণয় করে খেতে দিল কলার ভিতর ওষুধের নামে কি সব। অজ্ঞতা ও অশিক্ষা সেই দিনই অভিমন্যুর জীবনে বিপদের লাল দাগ এঁকে দিল। বিপদের লাল দাগকে আমরা সহজে অতিক্রম করতে পারিনা। বেঁচে থাকার একটা নিয়ম রোগকে এড়িয়ে চলা। অথচ এই রোগ নির্লজ্জ ভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গী হয়, আমরা বিপদে পড়ি এবং সেই বিপদ থেকে উদ্ধারেরও চেষ্টা করি।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ মানুষকে রোগ থেকে সারিয়ে তোলার জন্য, নানা রকম পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে। তাদের পরিমিত বুদ্ধি ও চিন্তার জন্য রোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ঈশ্বর, ভূত, প্রেত, গ্রহরাশি ইত্যাদির প্রভাব-এর জন্যই ভাবতে শিখেছে। স্বভাবতই চিকিৎসায়ও

সেই ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য অত্যাচার এবং মন্ত্র-তন্ত্র তাবিজ কবজ ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। অন্য দিকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষও আবার ধারালো পাথর দিয়ে ছোটবড় অপারেশন করেছে। রোগমুক্তির জন্য প্রাকৃতিক নানা উপাদান, গাছ গাছড়া ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছে মানুষ।

প্রাচীন যুগ থেকে ভারতবর্ষের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ গড়ে উঠেছে। আজও প্রচলিত আছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী। বৈদিক যুগ থেকে (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০) আয়ুর্বেদের জন্ম বলা চলে। সেই সময় 'দেবতা, অসুরের সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত 'ধন্বন্তরী'-কে চিকিৎসার দেবতা বলে গণ্য করা হোত এবং তার কৃপায় মানুষের রোগমুক্তি ঘটত এই ছিল ধারণা। অথর্ববেদের চিকিৎসার দিককে আরো উন্নততর করে আয়ুর্বেদের জন্ম বলে অনেকে মনে করেন।

আয়ুর্বেদের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে আয়ুর বেদ—জীবনের বিজ্ঞান। প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদের কর্ণধার ছিলেন আত্রেয়, চরক, সুশ্রুত। আত্রেয়কে (প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টপূর্ব) প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক হিসাবে ধরা হয়। তিনি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলায় বাস করতেন। বুদ্ধের সময় আয়ুর্বেদ ছিল প্রাণশক্তিতে ভরপুর। উন্নতির শিখরে উঠেছিল রাজা আশোকের আমলে (২২৬ খ্রীষ্টপূর্ব)। অন্যান্য বৌদ্ধরা আয়ুর্বেদের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করে স্কুল ও হাসপাতাল গড়ে তুললেন। চরক (২০০ খ্রীষ্টপূর্ব) সবচেয়ে জনপ্রিয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসাবে আজও সমাদৃত। উনি ছিলেন বৌদ্ধ রাজা কনিষ্কের চিকিৎসক। আত্রেয়ের শিক্ষাকে ভিত্তি করে উনি চিকিৎসা বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'চরক সংহিতা' সম্পাদনা করেন। একই রকম ভাবে বারাণসীর সুশ্রুত অস্ত্রোপচার ও নানা চিকিৎসা পদ্ধতির বিকাশ ঘটান। আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সময়কালের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত সুশ্রুত সংহিতা সংকলিত হয়। সুপ্রাচীনকালে

ভারতবর্ষে শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞান এই বই থেকে পাওয়া যায়। সেই সময় ভারতের সার্জেনরা ভাঙা হাড় জোড়া দিতেন, টিউমার অপারেশন, অ্যাম্পুটেশন করতেন, করতেন হার্ণিয়া অপারেশন, চোখের ছানি কাটতেন। 'ত্রিদশা তত্ত্ব' (বায়ু, পিত্ত, কফ) আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূলকথা। এইগুলির ভারসাম্য রক্ষার ওপর নির্ভর করবে মানুষের সুস্থ থাকা বা না থাকা। ঐ সময়ে গ্রীসদেশেও এই ধরনের 'চাররসের তত্ত্ব' প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন হিন্দু, আরব, পার্সিয়ান গ্রীক প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। চলতো ভাবের আদান প্রদান। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিদ্যা যে বিপুল ভাবে বিকাশলাভ করেছিল তা সন্দেহাতীত। স্বর্ণ-যুগ ছিল ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নানা বৈদেশিক আক্রমণে ও বিশেষত মোগল আমলে এবং পরবর্তী সময়ে সরকারী আনুকূল্যের অভাবে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যময় প্রচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হতমান হয়ে পড়ে।

১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরেও রোগ চিকিৎসার জন্য নানান পদ্ধতি চালু ছিল—চালু ছিল রোগের বিরুদ্ধে নানান দাওয়াই। প্রায় সাতশ' ধরনের ওষুধ ঐ সময় প্রচলন ছিল—যদিও চিকিৎসা চলত ঈশ্বরের নামে। চিকিৎসাদেবীর নামাঙ্কিত মন্দিরে চলত চিকিৎসা শিক্ষা।

পরবর্তী সময়ে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীকেরা চিকিৎসাবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। তারা তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও সভ্য করে তুলেছে। মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছে 'কেন' এবং 'কেমন করে'। চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিপোক্রিটিসের কাছে চিকিৎসাবিদ্যা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যাপারে তখনকার মানুষতো বটেই আধুনিক সভ্যতাও যথেষ্ট ঋণী। হিপোক্রিটিস তত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যাকে ম্যাজিক অন্ধবিশ্বাসের ধারণা থেকে তুলে এসেছে বিজ্ঞানের পর্যায়ে। তিনি বলতেন মানুষের শরীরে যা ঘটছে তাকে দেবতার বা অপদেবতার কারসাজি বলে

উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়েই ঘটনাগুলি উপলব্ধি করতে হয় এবং তার থেকেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

গ্রীকরা যখন তাদের চিকিৎসা শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত রোমানরা তখনও ছিল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। রোগ মানেই দেবতার অভিশাপ এই ছিল ধারণা এবং প্রায় প্রত্যেকটি রোগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল একজন করে দেবতা।

খ্রীষ্টপূর্বের শেষ শতাব্দীতে সভ্যতার বিস্তার হোল রোমে। সেলসাস (২৫ খ্রীষ্টপূর্ব—৫০ খ্রীষ্টাব্দ), গ্যালেন (১৩০ খ্রীষ্টাব্দ—২০৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ চিকিৎসকরা পরীক্ষামূলক চিকিৎসাবিদ্যার পথ প্রদর্শক ছিলেন। গ্যালেন রোগের কারণ হিসাবে নানাদিকের সঙ্গে সামাজিক ও পরিবেশ জনিত কারণের কথা উল্লেখ করলেন।

রোমসাম্রাজ্যের পতনের পর শুরু হোল অন্ধকারময় যুগ। মধ্য-যুগের (৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস হোল অধঃপতনের ইতিহাস, পিছিয়ে পড়া যুগের কাহিনী। মধ্যযুগ অধোগতি, পশ্চাৎমুখিতা, সংস্কার ও কুড়েমির কাহিনী। রোগ সম্বন্ধে ছিল প্রাচীনতম ধ্যান-ধারণা, রোগ নির্ণয় ও তার পরিণতি নির্ভর করত আকাশের তারা আর রোগীর পেচ্ছাপের অবস্থা দেখে। চিকিৎসা নির্ভর করত রক্তপাত ঘটানো এবং কতকগুলি গাছগাছড়া ব্যবহারের ওপর—যার সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিলনা। শারীরবিদ্যা শেখানো হোত পশু শবব্যবচ্ছেদ করে ইত্যাদি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যখন এই অবস্থা আরবদেশে তাদের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি ইউনানি গড়ে উঠল। গ্রীক রোমানদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র অনুবাদ করা হোল। অবশ্যি বিভিন্ন রোগ ও তার কারণ সম্বন্ধে ধারণা ছিল অস্বচ্ছ।

অন্ধকারময় মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হোল। শিল্পবিপ্লব মানুষের জীবনযাত্রা ও চিন্তা

ভাবনার মানকে উন্নততর করে তুলল। বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিদ্যা থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে এর বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করলেন।

জীবাণু ও প্রতিষেধক

ভেরোনার হিরোনিমাস ফ্রাকাসতোরিয়াস (Hieronymus Fracastorius) ১৫৪৬ সালে প্রকাশিত তাঁর De. Contagione বইতে লিখলেন, সমস্ত রোগই জীবাণুর দ্বারা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে সংক্রামিত হয়। তিনি ব্যাখ্যা করলেন অদৃশ্য বীজ বা জীবাণু বিভিন্ন ধরনের থাকে এবং বিভিন্ন রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু দায়ী।*

লিভেনহুকের (Leeuwenhook) মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত অনেকেই ফ্রাকাসতোরিয়াসের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ১৬৭৫ সালে লিভেনহুক অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। যেকোন বস্তুকে দুশ গুণ বড় করে দেখা গেল ঐ যন্ত্রে, এবং এক মাইক্রোমিটার

---

* অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান নয় এমন কৃমির কথা উল্লেখ আছে আয়ুর্বেদেও। আয়ুর্বেদের পরিভাষায় তাকে বলা হয় অদৃশ্য কৃমি। আয়ুর্বেদীয় মতে এক ধরনের শিরোরোগ আছে যার নাম শঙ্খক (Encephalitis-এর সঙ্গে তুলনীয়)। এই রোগ হলে শিরঃস্থানের সবকিছুই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বায়ু পিত্ত, কফ আর রক্তের কিংবা ওর সংগে কৃমির যতরকম লক্ষণ হয় সব শঙ্খক রোগে হয়।

আয়ুর্বেদীয় মতে পোলিও রোগও হয় এক ধরনের কৃমির জন্য। তরুণাস্থিতে (Cartilage) কৃমির জন্যই নাকি এই রোগ হয়। সেই একই কথা অদৃশ্য কৃমি। পরে জানা গেছে এ সব রোগের জন্য ভাইরাস দায়ী। পুরোনো দিনে ভারতের চিকিৎসকরা অধুনা আবিষ্কৃত ভাইরাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা পোষণ হয়তো করতেন।

(সূত্র চিরঞ্জীব বনৌষধি/তৃতীয় খণ্ড)

ব্যাসের সূক্ষ্ম কণাও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হোল। তিনি কিছু জীবাণুর সন্ধান পেলেন। তাঁর দেখা জীবাণুগুলিই যে রোগের কারণ এরকম আলোচনা শুরু হোল।

এরপর ইটালীর লাজারো স্পালানজনি (Lazaro Spallanzani) ১৭৬৫-১৭৭৬ সাল ব্যাপী ও পাস্তুর ১৮৬০ থেকে ৬৪ সালে জীবাণু-তত্ত্বের গবেষণা চালালেন। তাঁরা বললেন মাটি জল বাতাসে ঘুরে বেড়ানো অসংখ্য রোগ জীবাণুর কয়েকটি মাত্র মানুষকে আক্রান্ত করে।

মানুষের শরীরে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য প্রথম টিকা আবিষ্কার হয় ইউরোপে ১৭৯৬ সালে। তখনকার দিনে বসন্তরোগ সভ্যজগতের এক বিভীষিকা ছিল। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব বছরের পর বছর হোত আর কয়েক বছরে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ডেকে আনতো এই রোগ। যারা বেঁচে থাকতো তারাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকত না, হয় কুৎসিৎ দাগ-কলঙ্কিত হয়ে থাকত নতুবা বন্দী হোত চির অন্ধত্বে। ইংরেজ চিকিৎসক ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার গো-বসন্তের বীজ দিয়ে এক প্রকার টিকা তৈরী করার আগে রোগ প্রতিরোধের কোন ধারণা ছিল না ইউরোপীয়দের। এডওয়ার্ড জেনার ছিলেন ইংলণ্ডের গ্লসটার শায়ারের এক খামার মালিকের ছেলে। লণ্ডনে ডাক্তারী শিক্ষার শেষে জেলায় প্রাকটিস শুরু করেন। ঐ সময় তাঁর নিজের গ্রামে লোকের ধারণা ছিল যে সব লোকেরা গরুর পরিচর্যা করতে গিয়ে গো-বসন্তে আক্রান্ত হয় তাদের আর বসন্ত হয়না। ব্যাপারটা জেনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গো-বসন্ত দিয়ে মানুষের মধ্যে বসন্তের সংক্রমণ রোধ করা যায় কিনা এই নিয়ে জেনার দীর্ঘ কয়েক বছর কাজ চালিয়ে সফল হোলেন। দু' বছর ধরে তিনি তেইশজন রোগীর ওপর টিকা প্রয়োগ করে ঐ টিকার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আরো নিঃসন্দেহ হলেন। ১৭৯৮ সালে এই নিয়ে তিনি একটি বইও লিখলেন। জেনারের আবিষ্কার তখনকার মানুষ সহজ মনে নিতে পারে নি। তাঁর নিজের

দেশে দুচারজন ডাক্তার এই প্রথার কার্যকারিতা বুঝলেও বেশীর ভাগ লোকই এর বিরোধিতা করল। এদের বিশ্বাস জন্মাতে বেশ কয়েক বছর লাগল। পরে চিকিৎসকরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন এবং টিকার সাহায্যে অনেকেরই জীবন বসন্তের করাল কবল থেকে রেহাই পেল। ডাঃ জেনার বসন্তের টিকা আবিষ্কার করলেও ঐ রোগের জীবাণুর কথা কিন্তু তাঁর জানা ছিল না। সেযুগে জীবাণু দ্বারাই যে রোগের সৃষ্টি হয় তাও জানা ছিল না।

১৮৭৬ সালে রবার্ট কক (Robert Koch) এনথ্রাক্স রোগের জীবাণুর সন্ধান পেলেন। তিনি ১৮৮২ সালে টি বি রোগের এবং ১৮৮৩ সালে কলেরার জন্য দায়ী জীবাণুর সন্ধান পেলেন। প্রতিষ্ঠিত হোল হেনলি জেকভের 'প্রত্যেকটি রোগের জন্য বিশেষ বিশেষ রোগ জীবাণু দায়ী' এই মত। সে সময় ভাইরাস সম্বন্ধে ধারণা ঠিক স্বচ্ছ ছিল না, কতকগুলি রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থ হচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। ১৮৮২ সালে পাস্তুর ও তাঁর সহকর্মীরা পাগলা কুকুর বা নেকড়ের কামড় থেকে সৃষ্টি হওয়া মারাত্মক রোগ নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। তাঁরা এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণু খুঁজে পেলেন না। আক্রান্ত জন্তুর মস্তিষ্ক কোষ ও লালা সুস্থ কুকুর বা খরগোসের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেখলেন তারাও আক্রান্ত হচ্ছে। তাঁরা ভাবলেন এটি এমন একটি বস্তু যা খালি চোখে দেখা যায় না। তাঁরা এও ভাবলেন এটি ক্ষুদ্র ব্যাক্টেরিয়াও হতে পারে। ১৮৯২ সালে আইভানোস্কি (Ivanoski) এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। সে সময় তামাক পাতায় একধরণের সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছিল। আইভানোস্কি রোগাক্রান্ত তামাক পাতার রসকে খুব সূক্ষ্ম ফিলটার দ্বারা (ঐ ফিলটারে ব্যাক্টেরিয়া প্রবেশ করতে পারে না) ছেঁকে নিয়ে সুস্থ পাতাতে ঢুকিয়ে দেখলেন সেটিও আক্রান্ত হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হোল এই রোগের জন্য ব্যাক্টেরিয়া নয় অন্য কোন জীবাণু দায়ী। পরবর্তী সময়ে লোফলার (Loeffler) এবং ফ্রস (Frose) ১৮৯৮ সালে এবং আগ্রামন্টি

(Agramonte) ও লাজিয়ার (Lazear) ১৯০০ সালে আরো গবেষণা চালালেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর ভাইরাস দৃষ্টিগোচর হোল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রতিষেধক ওষুধের বিশেষ উন্নতি হয় নি। তারপর লুই পাস্তুর, রবার্ট কক, পল-অর্লিক, কালমেড, গেরিন প্রভৃতি মহাবিজ্ঞানীদের আবিষ্কার নতুন দিগন্তের সূচনা করল। জেনারের গো-বসন্ত আবিষ্কারকে সম্মান জানিয়ে পাস্তুর প্রতিষেধকের নামকরণ করলেন vaccine (ল্যাটিন শব্দ vacca কথার অর্থ গরু)।

রোগ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক জীবন

—লুই পাস্তুর

প্রায় একশ বছর আগের কথা। কয়েক ডজন মানুষ, তাদের অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীর, চলেছে প্যারিসের একটা ছোট্ট ল্যাবোরেটারীতে। ওখানে কাজ করেন রোগা লিকলিকে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা এক ছোটখাট মানুষ। তাঁর আবার একটা পা কিছুটা অবশ। এই মানুষটির কাছে দৈনিক ছুটে আসে নানান দেশের নানান শ্রেণীর মানুষ। আজ যারা এসেছে তাদের মধ্যে উনিশজনের একটি দল রাশিয়ান কৃষক। দিন পনেরো আগে একটি পাগলা নেকড়ে তাদের ক্ষতবিক্ষত করেছে। অবশ্যম্ভাবী জলাতঙ্কের মৃত্যুভয় তাদের ছুটিয়ে, এনেছে সুদূর প্যারিসে—সম্পূর্ণ মরীয়া হয়ে প্রাণের দায়ে তারা এসেছে পাস্তুরের কাছে। তারা শুনেছে ১৮৮৫ সালের ৬ই জুলাই পাস্তুরের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের কথা। জলাতঙ্ক প্রতিষেধক আবিষ্কার-এর আগে পাস্তুর বিশেষত বৈজ্ঞানিক মহলেই পরিচিত ছিলেন। এই রোগের তত্ত্ব ও প্রতিষেধক আবিষ্কার তাঁকে এনে দিল সারা পৃথিবীব্যাপী মানুষের জীবনদাতার সম্মান।

অনেক বিখ্যাতজনের জন্ম অনেক অখ্যাত জনপদকে লোকচক্ষুর গোচরে নিয়ে আসে। ১৮২২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর লুই পাস্তুরের জন্মস্থান পূর্বফ্রান্সের ছোট্ট শহর জুরাকে লোকপরিচিতির জয়টিকা পরিয়ে দেয়। পাস্তুরের বয়সের সঙ্গেই বাড়তে থাকে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের অদম্য উৎসাহ। যা তাঁর ভবিষ্যতের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির চাবিকাঠি।

পাস্তুর তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশুনা করেন আরবোইসের স্কুলে। ওখানেই তাঁর পরিবারের সবাইকে তখন

থাকতে হয়েছিল। ১৮৪০ সালে আর্টসে এবং ১৮৪২ সালে ব্যাসানকনের রয়েল কলেজ থেকে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৮৪৫ সালে বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী এবং ১৮৪৭ সালে ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি অর্জন করেন।

১৮৪৮ সালে পাস্তুর স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক হোলেন। বিয়ে করলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটরের মেয়ে মেরী লুরেন্টকে। পাস্তুর বরাবরই প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে। তিনি বুঝেছিলেন যে, নতুন সৃষ্টির জন্য ঐতিহ্যের আগাছা নিঙড়ে ফেলতে হবে তাই ১৮৬৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন হওয়ার পরই সেখানকার প্রচলিত গতিহীন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনে মনযোগী হলেন। পাল্টে দিলেন অনেক নিয়ম, চালু করলেন বহু নতুন পদ্ধতি। কারখানার শ্রমিকদের জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইট ক্লাসের ব্যবস্থা করে স্থাপন করলেন এক নতুন নজির। তিনি মনে করতেন শিক্ষার তত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে অবশ্যই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে। শিক্ষাকে তত্বের পোশাক পরিয়ে বড় কথার আড়াল রেখে তার কৃত্রিম কৌলীন্য বজায় রাখার বিরোধিতা করলেন তিনি। শিক্ষা ও জীবনের সমার্থক রূপ দেবার বাসনায় তিনি শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধানো প্রাঙ্গণে বন্দী না রেখে তাকে মুক্ত করেছিলেন কারখানা পর্যন্ত বিরাট বাস্তব জীবনে। যেখানে শিক্ষা তার তত্বকে বাস্তবের আস্বাদ নিয়ে প্রয়োগ করতে পারবে জীবনের মর্মমূলে।

পাস্তুর শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগে উৎসাহী ছিলেন। মশগুল ছিলেন নতুন আবিষ্কারের নেশায়। ছেলেবেলা থেকেই তার মস্তিষ্কে বোধহয় এক বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকা হয়েছিল। তাই বোধ হয় 'কেন?' এই প্রশ্ন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো সব সময়। সে সময় সবারই ধারণা ছিল যে বাতাস লেগে প্রায় সব খাদ্য দ্রব্যই আপনা-আপনি পচে যায়। এই 'আপনা-আপনি' কথাটা পাস্তুরের চিন্তাশীল মনকে লজ্জা দিল। তিনি গবেষণা আরম্ভ করলেন এবং সফলও

হলেন। 'আপনা-আপনি' কথাটিকে হত্যা করে এক রকমের জীবাণু আবিষ্কার করলেন। যা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করার জন্য দায়ী। সে সব জীবাণু বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। বললেন, খাদ্যদ্রব্যকে গরম করে জীবাণু মেরে ফেল, বায়ুমুক্ত করে তাকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা কর।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিভেনহুক অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে জল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন ছোট ছোট পোকার মত কি যেন কিলবিল করছে—আবিষ্কার হয়েছে জীবাণুলোক, তারপর কেটে গেছে বহু বছর। ঐ জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি—জানা যায় নি তারা মানুষের কি ক্ষতি করে বা তার থেকে পরিত্রাণের উপায়। লুই পাস্তুর এ সম্পর্কে দীর্ঘ গবেষণা চালালেন। তিনি বললেন মিষ্টির দোকানের চিনির রস, আখের গুড় ইত্যাদি পচে বা গেঁজে যাওয়ার কারণ বাতাসের জীবাণুরা ওর মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। আর ঐ সব খাবার খেয়ে নানারকম রোগে আক্রান্ত হয় মানুষ। তিনি প্রমাণ করলেন পশুপাখি কীট পতঙ্গের মধ্যেও আছে নানা প্রকার জীবাণু যার থেকে নানা রোগে আক্রান্ত হয় তারা।

রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে জেহাদ

দক্ষিণ ফ্রান্সের লোকেরা রেশমের জিনিস তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। তার জন্য ফ্রান্সে গুটিপোকা চাষের চলন ছিল খুব বেশি। ১৮৬৫ সাল নাগাদ গুটিপোকায় মড়ক লাগল। ফ্রান্সের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ যে সিল্ক উৎপাদন তা প্রায় বন্ধের মুখে পড়েছিল। এর প্রতিকারের ভার পড়ল পাস্তুরের ওপর। গুটিপোকার চাষীরা হোল দুঃখিত, সাধারণ লোকেরা হল বিস্মিত, ঈর্ষান্বিত হলেন অপর বিজ্ঞানীরা। যে কাজ প্রাণীতত্ত্ববিদের তা কেন একজন রসায়নবিদকে দেওয়া হোল এই নিয়ে উঠল তুমুল সমালোচনা। সে সমালোচনায় পাস্তুরের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না। ১৮৬৫ সালে

পাস্তুরের নেতৃত্বে সরকারী মিশন দক্ষিণ ফ্রান্সে এই রোগের উৎস সন্ধানে চলল। পাস্তুর বিভিন্ন জায়গায় প্রায় বছর তিনেক কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে কাজ চালিয়ে দেখলেন দু ধরনের ব্যাসিলাস (Bacilli) এই রোগের উৎপত্তির কারন। এই রোগের প্রতিরোধের উপায়ও বাতলালেন তিনি। সবাই আর একবার বিস্মিত হল।

১৮৬৮ সালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে পাস্তুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলস্বরূপ আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। অবশ্য দীর্ঘ অসুস্থতার পর ধীরে ধীরে পক্ষাঘাত থেকে তিনি খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই অবস্থায়ও তাঁর নতুন গবেষণার কাজ থেমে থাকে নি।

মদের ব্যবসাটা ফ্রান্সকে সবদিনই অনেক টাকা দিয়ে আসছে। হঠাৎ এক সময় মদের ব্যবসায়ীরা দেখলেন কোন এক অজ্ঞাত কারণে মদ আগের তুলনায় অনেক নিম্নমানের কেমন যেন চটচটে তেতো হয়ে উঠছে। বাজার মন্দা হোল—টান পড়ল অর্থনীতিতে, সরকারের দৃষ্টি পড়ল মদ কারখানার ওপর, ডাক পড়ল পাস্তুরের। ১৮৭০ সালে পাস্তুর গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। মদ নষ্ট করার জন্য দায়ী এক ধরনের জীবাণুকে পাস্তুর চিনে ফেললেন। তিনি দেখালেন বাতাসে ঘুরে বেড়ানো এক ধরনের বিষাক্ত জীবাণুর এই অপকীর্তি। পাস্তুরের মত অনুযায়ী জীবাণুরা কখনোই নিজে থেকে জন্মাতে পারে না, উপযুক্ত জায়গা পেলেই তারা ঘাঁটি গাড়ে। জীব জগৎ সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের অবদানের মতো জীবাণুসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ছিল তখনকার মানুষের অস্পষ্ট ধারণা, যা মূলত ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাস্তুর বললেন অন্য কথা—একটা জীবন সৃষ্টি হতে পারে সেই জাতীয় আর একটা জীবন থেকে।

পাস্তুর জীবাণুমুক্ত করার জন্য পরামর্শ দিলেন- আঙ্গুর রসকে আগে ফুটিয়ে জীবাণু মেরে ফেলে বাতাসের সংস্পর্শে আসা বন্ধ করলেই জীবাণু আক্রমণ রোধ করা যাবে এবং মদ বিষিয়ে উঠবে না। পরে

ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী যোসেফ লিষ্টারের নজরে পড়ল এই ঘটনা। তিনি ভাবলেন এই উপায়ে যদি মদের জীবাণু দূষণ বন্ধ করা যায় তাহলে ক্ষতদূষণও বন্ধ করা যাবে না কেন। জীবাণু মারতে এক্ষেত্রে তো উত্তাপের সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয় তাই কার্বলিক অ্যাসিডের সাহায্য নিলেন। তবে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না তাতে। এবার তিনি কার্বলিক অ্যাসিড মাখানো কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে তা বায়ুমুক্ত করলেন। এতে ফল পাওয়া গেল। পরে পরে এই পদ্ধতি চালিয়ে আরো অনেক ক্ষত সারিয়ে তোলা সম্ভব হোল।

প্রচলিত সংস্কার না পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তঃ ১৮৮১ সালের কথা। ফ্রান্সের গরু ঘোড়ার মধ্যে এক মারাত্মক রোগ দেখা দিল। গরু ঘোড়ার মড়ক লেগে গেল। প্রাণী চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা হার মানলেন এই রোগের কাছে। এর কারণ বা চিকিৎসা কোনটাই ঠাওর করতে পারলেন না তারা। সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে ভেড়ার মধ্যেও এই রোগ সংক্রমিত হোল। সবশেষে পাস্তুরকে ডাকতে হোল। জীবাণুবিদ হিসেবে তখন তাঁর জগৎজোড়া নাম। বিপুল উৎসাহে তিনি কাজে নেমে পড়লেন। গরু ঘোড়া, ভেড়ার রক্ত নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পেলেন একরকম জীবাণু। তিনি বললেন এদের শরীরে আছে এ্যানথ্রাক্স (Anthrax) রোগের জীবাণু যার ফলে এরা মারা যাচ্ছে। এই মড়ক দূর করতে হলে তাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। পাস্তুর অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু ইঁদুর খরগোসের শরীরে ইনজেকশান দিয়ে দেখলেন তারাও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে আরো অনুসন্ধান চালালেন তিনি। তিনি বললেন মৃদু রকমের এই জীবাণু কোন পশুর রক্তে মিশিয়ে দিলে তার এই রোগ খুব স্বল্প ভাবে দেখা দেবে কিন্তু ভবিষ্যতে ঐ রোগের মারাত্মক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে সে। যে জীবাণুতে এই মারণরোগ হয় সেই জীবাণু প্রাণীর শরীরে ঢুকিয়ে সেই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া ব্যাপারটা আপামর জনসাধারণের

কাছে হাস্যকর মনে হোল। পশুশাস্ত্রবিদেরা পাস্তুরকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানালেন। পাস্তুর তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বসমক্ষে পরীক্ষা করে দেখাতে সম্মত হলেন। ঐ বছরের ২রা জুন বিরাট জমায়েতের সামনে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে পাস্তুর তাঁর পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত নিয়ে উপস্থিত হলেন। পরীক্ষা প্রমাণের জন্য পাস্তুরের নেওয়া পঞ্চাশটি সুস্থ ভেড়ার পঁচিশটিকে তিনি অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর মৃদু টিকা দিলেন, বাকীগুলিকে দিলেন না। কিছুদিন পর পঞ্চাশটি ভেড়াকেই দেওয়া হোল তীব্র সতেজ অ্যানথ্রাক্স জীবাণু। দেখা গেল যে পঁচিশটিকে মৃদু টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের সবগুলিই সুস্থ আছে কারণ তাদের শরীরে গড়ে উঠেছে ঐ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা। যাদের টিকা দেওয়া হয় নি সবকটিই ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে ফরাসী একাডেমির সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি। সেখানেই তাঁর যুগান্তকারী কাজ জলাতঙ্করোগের কারণ ও তার প্রতিষেধক আবিষ্কার। ১৮৮৫ সালের ৬ই জুলাই কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়া যোসেফ মিষ্টার নামের সেই ছেলেটির শরীরে প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার সুযোগ পেলেন তিনি। ছেলেটি বেঁচে গেল। যোসেফ মিষ্টারের প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনা শুধু ফ্রান্সে নয় সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করল। যে কোন নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের প্রয়োজনে লাগানোর সময় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে আবিষ্কারককে। পাস্তুরের ক্ষেত্রেও জুটল বিরোধিতা ও লাঞ্ছনা। ইতিমধ্যে তিনি দ্বিতীয় রোগী পেয়ে গেছেন। ছেলেটির নাম জা ব্যাপটিসটে জুপিলে। পাগলা কুকুরের কামড় থেকে সহকর্মীদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল সে। যোসেফ মিষ্টার এসেছিল তিন দিন পরে আর জুপিলেকে আনা হল কামড়ের সাতদিন পরে। পাস্তুর একেও ভ্যাকসিন দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন।

ফরাসী সরকার তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৮৮ সালে প্যারিসে পাস্তুর ইনষ্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। যেখানে হবে

জলাতঙ্ক রোগের গবেষণা, প্রতিষেধক প্রস্তুতি এবং এই রোগের চিকিৎসা। পাস্তুর অসুস্থ থাকলেও আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন।

জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার-এর ঘটনা পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল। ইতিপূর্বে যা কখনো দেখা যায় নি স্কুলের ছেলেরা চাঁদা তুললো, ইটালির একটি পত্রিকা পাঠকদের কাছ থেকে ৪০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করল, রাশিয়ার জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ৭০০০ পাউণ্ড পাঠালেন, ব্রাজিলের সম্রাট, তুর্কির সুলতান তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এ সবই পাস্তুর ইনষ্টিটিউট গড়ে তুলতে আরো সাহায্য করল। ১৮৯৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাস্তুরের মৃত্যু হয়। তাঁর নামে যে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেই তাঁর সমাধি রক্ষিত আছে। এই গবেষণাগারের প্রাঙ্গণে একটি মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে—মেষপালক বালককে আক্রমণ করছে একটি কুকুর আর ছেলেটি বাধা দিচ্ছে।

যোসেফ মিষ্টারের কি হোল—সেই সেদিনের ছেলেটি পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের দারোয়ান নিযুক্ত হোল। প্রায় পঞ্চাশ বছর টানা দক্ষতার সঙ্গে ঐ কাজ চালিয়ে তার প্রাণের প্রতিষ্ঠানকে আগলে রাখার কাজ করে গেল যোসেফ। ১৯৪০ সালে জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করল। নাৎসী সৈন্যরা ঢুকে গেল ফ্রান্সে। অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে চলল বীভৎস ধ্বংসলীলা, নাৎসীরা যোসেফকে চাপ দিল পাস্তুরের পাণ্ডুলিপি দেওয়ার জন্য। যোসেফ মিষ্টার হাজার হাজার মানুষের, তাদের উত্তর-সূরীদের প্রাণ বাঁচানোর সম্পদ নরপশুদের হাতে তুলে দেওয়ার থেকে তার প্রাণ দেওয়াই শ্রেষ্ঠ মনে করল। আত্মঘাতী হল সে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান গবেষণায় পাস্তুর যুগান্তর আনেন। বিভিন্ন রোগের কারণ আবিষ্কার-এর সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে পরিত্রাণের উপায় দেখিয়ে দেন। তাঁর কুসংস্কারবিরোধী জিজ্ঞাসু মন, অনুসন্ধিৎসা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ প্রবণতা রোগ প্রতিষেধক, কৃষি গবেষণা ও অন্যান্য জন-

কল্যাণকর কাজে নিবদ্ধ ছিল। বহু প্রতিকূল অবস্থা ও বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও পাস্তুর তার লক্ষ্য থেকে সরে আসেন নি।

পাস্তুরের সত্তরতম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সমসাময়িক বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার যোসেফ লিষ্টার পাস্তুরকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বলেন—'এই বিশাল পৃথিবীতে এমন একজনও নেই যার কাছে চিকিৎসা বিজ্ঞান আপনার থেকেও বেশি ঋণী।' এই সম্বর্ধনার উত্তরে পাস্তুর বলেন—'বিজ্ঞান ও শান্তি একদিন অজ্ঞানতা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। বিভিন্ন দেশ ঐক্যবদ্ধ হবে হানাহানির জন্য নয়, পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য, গড়ে তোলার জন্য। যারা মানব সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করবে ভবিষ্যৎও তাদের পাশে দাঁড়াবে।' এরপর লিষ্টার ও পাস্তুর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন আর উপস্থিত দেশী-বিদেশী প্রতিনিধিরা পাস্তুরের নামে জয়ধ্বনি দিল—'Vive Pasteur.'

আমাদের সচেতন ভাবে স্বীকার করতেই হবে যে পাস্তুর কুসংস্কার-এর অন্ধকারকে সরিয়ে বিজ্ঞানের নিতল গভীরে ডুব দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তুলে এনেছেন জাগরণের সোনার কাঠি।

জীবননাশী জলাতঙ্ক

জলাতঙ্ক রোগটি হয় এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে। ল্যাটিন শব্দ র‍্যাবিও (Rabio) কথার অর্থ হোল পাগল হয়ে যাওয়া, এর থেকেই নাম র‍্যাবিজ (Rabies)। পুরোনো গ্রীক নাম ছিল Lyssa—একথাটির অর্থও পাগলামি। আবার চালু কথা হাইড্রাফোবিয়ার Hydro—জল, Phobos-আতঙ্ক।

সাধারণতঃ পাগলা কুকুর থেকেই এই রোগ ছড়ায়। এছাড়াও বিড়াল, বাদুড়, নেকড়ে, কাঠবিড়াল, ভালুক, সলোমচর্ম প্রাণী যেমন, ভোদড়, নকুল, গন্ধগোকুল, খটাস ইত্যাদিও এই রোগ বহন করে। বানর যদি পোষা হয়, কুকুর ইত্যাদির সংস্পর্শে আসার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে এবং তখন সে সন্দেহজনক রোগ বহনকারী হয়ে উঠে। কুকুর প্রায় শতকরা ৯৯ জনের ক্ষেত্রে জলাতঙ্কের জন্য দায়ী, রাস্তার কুকুর থেকেই হয় বেশি পোষা কুকুর থেকেও হতে পারে। বিড়াল বাড়ির পোষা প্রাণীদের মধ্যে সব থেকে বেশি আদরণীয় হয়। বিছানায় শোয়ানো থেকে শুরু করে নানান আব্দার দিয়ে থাকেন অনেকেই। অথচ বিড়াল জলাতঙ্ক রোগের অন্যতম বাহক একথা মনেই রাখেন না তখন। অনেক সময় বেঁজী ও অন্যান্য পোষা জীবের কথা গ্রাহ্য করা হয় না। গ্রাহ্য করা হয় না পোষা বানরের কামড়কেও। যে কোন উষ্ণশোণিত স্তন্যপায়ী প্রাণী যে এ রোগের বাহক তা না-জানার জন্য এবং অনেক সময় স্রেফ অবহেলায় চিকিৎসার সুযোগ নেওয়া হয় না। কিছুদিন পরে হয়তো দেখা দেয় নানা উপসর্গ কিন্তু তখন ভুলে যাওয়া হয়েছে কামড়ের ইতিহাস।

জলাতঙ্কের ভূগোল

কেবলমাত্র অষ্ট্রেলিয়া, আণ্টারটিকা মহাদেশ ছাড়া সারা পৃথিবীতেই জলাতঙ্ক রোগ দেখা যায়। নিউজিল্যাণ্ড, সাইপ্রাস, হাওয়াই প্রভৃতি দেশে পোষা কুকুর ও বিড়ালের উপর আইন করে এই রোগকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। আমেরিকার মতো দেশও জলাতঙ্ক মুক্ত নয়। সেখানে বছরে প্রায় দশ লক্ষ লোককে কুকুর কামড়ায় আর প্রায় ৩০,০০০ জনকে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক দিতে হয়। তবে জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে।

বৃটেনে বাইরে থেকে আমদানীকৃত কুকুর বা বিড়াল জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে ১৮৮৬ সাল থেকে কোয়ারেনটাইন আইন বলবৎ থাকায় কোন র‍্যাবিজের ঘটনা ঘটে নি।[১] ১৯০২ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ও র‍্যাবিজের কোন ঘটনা ছিল না। ১৯১৮ সালে বেআইনি ভাবে ওখানে কুকুর আমদানী হওয়ার পর ১৪৪ জন পাগলা কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হয়। প্রতিষেধক নেওয়ায় জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয় নি কেউই। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ কুকুর আমদানী হয়েছে তাদের মধ্যে ২৭টি কুকুর র‍্যাবিজে আক্রান্ত হয়।

১৯৬৯ সালে জার্মানী থেকে আমদানীকৃত একটি কুকুরের পাগলা হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। তার মালিক এবং সংস্পর্শে আসা ৪১ জনকে প্রতিষেধক দেওয়ায় কেউই জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয় নি। আর একটি ঘটনা ঘটে একই বছরে। পাকিস্তান থেকে আনা একটি কুকুরের কোয়ারেনটাইনের তিনমাস পরেও পাগলা হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। এই সব ঘটনার পরে কোয়ারেনটাইনের সময় একবছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে আবার কোয়ারেনটাইনের সময় ছ' মাসে কমিয়ে আনা হয় এবং বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিটি কুকুর আমদানির সময়

---

১. সূত্র—Medical Bacteriology মূলসূত্র—G. M. Bayer—The natural history of Rabies (1975) —London Academic Press.

একটি এবং একমাস পরে দ্বিতীয় ডোজ এরকম দুটি প্রতিষেধক নেওয়ার নিয়ম চালু করা হয়।

ভারতবর্ষে জলাতঙ্ক ব্যাপক জনস্বাস্থ্য সমস্যার কারণ। সারা বছরই সমস্ত প্রদেশে এই রোগ দেখা যায়। সারা বছরে তিন লক্ষেরও বেশি রোগীকে এই রোগের প্রতিষেধক দিতে হয় এবং প্রায় দেড় হাজার রোগী এই রোগে মারা যায়।

১৯৭১ সালে টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর—সারা দেশে ৪১টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে এই সমস্ত হাসপাতালে ভর্তি রোগীর প্রতি ২০০০-এর একজন হচ্ছে জলাতঙ্ক। এ সংখ্যাও যে কত বিপুল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এ ছাড়াও হাসপাতালে এই রোগ নিয়ে আসেন না এরকম রোগীর সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। তাদের এ হিসেবের মধ্যে আনা হয়নি।

জলাতঙ্কের উৎস :

যে কোন কুকুর বা জন্তু কামড়ালেই যে জলাতঙ্ক হবে তার কোন মানে নেই। ঐ সব প্রাণী যদি আগে থেকে এই রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে তাদের লালাগ্রন্থিতে এই রোগের ভাইরাস থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে। এই প্রাণীরা যদি কামড়ে ক্ষত সৃষ্টি করে বা কাটা ঘায়ে জিভ দিয়ে চেটে দেয় তবে মানুষের শরীরে তাদের লালা মিশ্রিত ভাইরাস ঢুকে যায় এবং তখনই মানুষ আক্রান্ত হয় এই রোগে।

ঋতুভেদে কুকুর কামড়ের সংখ্যারও তারতম্য ঘটে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারী, শীতের সময় কুকুরী বাচ্চা প্রসব করে এবং সেই বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য কামড়ায়। আবার শীতকালে জমকালো রঙচঙে পোশাক তাদের আকর্ষণ করে ও ভীত করে তোলে। গরমের সময় ঘটনা কম। বর্ষাকালে আরো কম। ৫১৬ জন রোগীর পরিসংখ্যান

করে ডঃ ত্রিবেদি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত JIMA-তে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা হোল—

নভেম্বর—৬১	মে—৩৬
ডিসেম্বর—৬৩	জুন—৩৪
জানুয়ারী—৬১	জুলাই—৩০
ফেব্রুয়ারী—৪৬	আগষ্ট—২৭
মার্চ—৪৯	সেপ্টেম্বর—৩৩
এপ্রিল—৪১	অক্টোবর—৩৫

এই রোগ সংক্রমণের উৎসকে দুভাগে ভাগ করা যায়—শহুরে র‍্যাবিজ (Urban Rabies) ও বন্যজ (Sylvan Rabies).

রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বেওয়ারিশ অসংখ্য কুকুরই শহুরে র‍্যাবিজ-এর উৎস। সমস্ত জলাতঙ্ক রোগীর শতকরা নব্বুই ভাগই এই উৎস থেকে সংঘটিত হয়। আর বন্য মাংসাশী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বন্যজ র‍্যাবিজ-এর উৎস। বন্যজন্তুদের মধ্যে শেয়ালই বেশি দায়ী। তারাই গৃহপালিত পশুদের বেশি আক্রান্ত করে। ইউরোপে বন্যজন্তুদের মধ্যে শেয়াল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রোগের কারণ হয়। এরা পোষাজন্তুদের আক্রান্ত করে তবে মানুষ খুব অল্পসংখ্যকই এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লাতিন আমেরিকার ব্রেজিল, মেক্সিকো, ত্রিনিদাদ ইত্যাদি দেশে রক্তচোষা বাদুড় (Vampire bat—Desmodus Rotundus Murinus) এই রোগ বহন করে। এরা নিজেরা এই রোগে আক্রান্ত না হয়েও ভাইরাস বহন করে এবং গৃহ-পালিত পশুকে আক্রান্ত করে। পোকা-খাদক বাদুড় (Tadarida Mexicana)-এর প্রাদুর্ভাব মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, ত্রিনিদাদ এবং জামাইকাতে বেশি থাকলেও যুগোশ্লোভিয়া, জার্মানীতেও এদের দেখা

পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতবর্ষে বাদুড় থেকে জলাতঙ্ক হওয়ার ঘটনা দেখা যায় নি।[১]

জীবাণু না ভাইরাস : বস্তুত রোগ কিভাবে হয় বা ছড়ায় এই নিয়ে পাস্তুরের আগেই বিজ্ঞানী মহলে জীবাণুতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ভোরোনার ফ্রাকাসতোরিয়াস-এর মত ছিল সমস্ত রোগই জীবাণু দ্বারা ঘটে এবং এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে তা সংক্রামিত হয়। এই মতকে আরো পরিষ্কারভাবে বললেন ইটালির স্পালানজনি। তিনি বললেন সমস্ত রোগই আলাদা আলাদা জীবাণু দ্বারা সৃষ্টি। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন আগে থেকে ফুটিয়ে নেওয়া জল বদ্ধ ফ্লাস্কে রাখলে তাতে জীবাণু উৎপন্ন হয় না। এই তত্ত্বই তখন বেশি জনপ্রিয় ছিল। পাস্তুরও এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হলেন। পাস্তুরের সহকর্মী এমিলি রোজ (Emile Roux 1853-1933) পাস্তুরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করে চললেন নানা নতুন নতুন আবিষ্কারে। তিনি প্রমাণ করলেন র‍্যাবিজ জীবাণু স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে।

পাস্তুর যথেষ্ট নমুনা জোগাড়ের জন্য পাগলা কুকুর সংগ্রহ করলেন অনেক, তাদের রাখলেনও যত্ন করে। খুব দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তাদের নিয়ে নড়াচড়া করতে হোত তাঁকে। পরীক্ষার কাজে তাঁকে নলের সাহায্যে মুখ দিয়েই পাগলা কুকুরের লালা সংগ্রহ করতে হোত—তখন জানা হয়ে গেছে পাগলা কুকুরের লালাতেই এই রোগের জীবাণু থাকে। তিনি পাগলা কুকুরের লালা খরগোসের শরীরে ইনজেকশন দিয়ে দেখলেন সেটিও আক্রান্ত হচ্ছে। আক্রান্ত খরগোসটিকে মেরে ফেলা হোল,—র‍্যাবিজ জীবাণুর মূল অবস্থান কেন্দ্র সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) খরগোসটির শরীর থেকে বার করে আনা হোল। এবার সুষুম্নাকাণ্ডকে শুকিয়ে ফেলা হোল, শুকিয়ে গেলে এই রোগের জীবাণুগুলিও দুর্বলতর হবে এই ভেবে। হোলও তাই। ১৪

১. মূলসূত্র—আই সি. এম. আর—১৯৬৭—Park & Park P.S,M.

দিন শুকোনোর পর গুঁড়ো করা হোল। গ্লিসারিনে সম্পৃক্ত করে সুস্থ প্রাণীর দেহে ইনজেকশন দিয়ে দেখা গেল তারা আর আক্রান্ত হচ্ছে না। তিনি র‍্যাবিজ-এর জীবাণু কিভাবে স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করছে তাই নিয়ে চালালেন নানা পরীক্ষা। সফলও হলেন তিনি। আরো নানা ভাবে পরীক্ষা চালালেন এই রোগের জীবাণুকে দুর্বলতর করার ব্যাপারে। গ্লিসারিন দিয়ে দ্রবণ তৈরি হোল, তার গাঢ়তা (concentration), সঠিক মাপও নির্ধারিত হোল। সম্প্রতি কুকুরে কামড়ানো প্রাণীকে দিয়ে দেখা গেল সেটি আর আক্রান্ত হচ্ছে না কিন্তু র‍্যাবিজ জীবাণুকে কিছুতেই তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় খুজে পেলেন না। চলল গবেষণা চলল নানা অনুসন্ধান। তবুও না। সিদ্ধান্তে এলেন এটি এতই ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাবে না। তিনি বললেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাক আর না যাক জীবাণু আছেই। তাঁর কথাই ঠিক হোল। পরে জানা গেল র‍্যাবিজের জন্য দায়ী একধরনের ভাইরাস।

বুলেট ভাইরাসের গতিমুখ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র : পরবর্তী সময়ে পাস্তরের উত্তরসূরীরা এই ভাইরাস নিয়ে আরো অনেক কাজ করেছেন। ফলে আমরা জেনেছি এই ভাইরাসের গঠন, প্রবেশপথ, অবস্থান ইত্যাদি। র‍্যাবিজ ভাইরাস কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে তাই ভাইরাস সম্পর্কে বলার আগে স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধীয় কিছু ন্যূনতম তথ্য দেওয়া প্রয়োজন।

দেহের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে তাদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করে স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রকে দুভাগে ভাগ করা যায়—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত। মস্তিষ্কের আবার বিভিন্ন অংশ আছে—লঘুমস্তিষ্ক, গুরু-মস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক, সুষুম্নাশীর্ষক ইত্যাদি, আর প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র—মস্তিষ্ক স্নায়ু, সুষুম্না স্নায়ু ও স্বশাসিত স্নায়ু নিয়ে গঠিত। আমাদের পিঠে বস্তিদেশ থেকে আরম্ভ করে ঘাড় পর্যন্ত যে হাড়গুলি থরে থরে সাজানো থাকে এই উপর্যুপরি সাজানো হাড়গুলি একযোগে হোল

মেরুদণ্ড। এই হাড়গুলির মধ্যে থাকা ফুটোগুলি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একটি নালার সৃষ্টি করেছে। এই নালা পথে একটি নরম সুতোর মত জিনিস মস্তিষ্ক থেকে একেবারে নালার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। একেই বলা হয় সুষুম্নাকাণ্ড। সুষুম্নাকাণ্ড পরাবর্তী ক্রিয়ার কেন্দ্র এবং অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্নায়ুর পরিবহন পথ। উদ্দীপনার সময় অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে উদ্দীপনা সুষুম্নাকাণ্ডে আসে, সেখানকার কোষগুলি বহির্মুখী স্নায়ুপথে পেশীতে শক্তি সঞ্চালিত করে, ফলে প্রতিক্রিয়া হয়।

সুষুম্নাশীর্ষকে সংবেদনবাহী ও ক্রিয়াবাহী স্নায়ুর কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। সুষুম্নাশীর্ষক উচ্চস্তরের কাজের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করে। এছাড়া সুষুম্নাশীর্ষক শ্বাসগ্রহণ ও রক্তসঞ্চালন কাজে সহায়তা করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যদি কোন জীবের সুষুম্নাশীর্ষকের নীচের অংশ কেটে দেওয়া হয় তবে শ্বাসগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়, রক্তচাপ অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায় এবং ঐ জীব মারা যায়। লঘু মস্তিষ্ক দেহভঙ্গী ও সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অংশ হোল গুরুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্ক দুই গোলার্ধে বিভক্ত এবং এরা বিপরীতভাবে দেহের নিম্নাংশের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ দেহের ডানদিকের সঙ্গে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ দেহের বাঁদিকের সঙ্গে সংযুক্ত। গুরুমস্তিষ্ক বিভিন্ন অঞ্চল বা lobe এ বিভক্ত। ললাট অঞ্চল, রগ অঞ্চল, শিরকুম্ভ অঞ্চল, শির-নিম্ন অঞ্চল ও হিপোক্যাম্পাল অঞ্চল। প্রত্যেকটি অঞ্চল বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

বারটি মস্তিষ্ক স্নায়ু মুখ চোখ, নাক, ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অংশের সংগে যুক্ত হয়ে সেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। স্বশাসিত স্নায়ুতন্ত্রকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—সমবেদী ও পরাসমবেদী। স্বশাসিত স্নায়ুতন্ত্র হোল বহির্মুখী স্নায়ুতন্ত্র। এই পথে যে শক্তি প্রবাহিত হয় তা গ্রন্থি, হৃদপিণ্ড এবং অন্তরযন্ত্র-এর অনৈচ্ছিক পেশী সমূহকে চালিত করে। এর প্রধান

বৈশিষ্ট্য হোল এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে স্বাধীন। সমবেদী স্নায়ু দ্বারা পরিবাহিত শক্তি উত্তেজক কিন্তু পরাসমবেদী স্নায়ু দ্বারা পরিবাহিত শক্তি নিরোধক।

এই ভাইরাস পোলিও, এনকেফাইলাইটিস ইত্যাদির মত স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিভাগের অন্যান্য অংশকেও পর্যুদস্ত করে যেমন মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লিকে আক্রান্ত করে প্রদাহ সৃষ্টি করে (Meningitis) যার জন্য এই সব ভাইরাসকে নিউরোট্রপিক ভাইরাস (neurotropic virus) বলা হয়। ভাইরাস সুষুম্নাস্নায়ুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছায় আবার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে রক্ত প্রবাহের (haematogenous route) মধ্য দিয়ে নেমে এসে প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্রকেও আক্রান্ত করে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতে পৌঁছে হিপো ক্যাম্পাস-এর স্নায়ুগ্রন্থী (ganglion) কোষ, লঘুমস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাশীর্ষকে জমতে থাকে। সব থেকে খারাপ অবস্থা দেখা যায় সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাৎবর্তী কোষে (Posterior horn cell of spinal cord) এবং পশ্চাৎবর্তী স্নায়ুগ্রন্থীতে (Posterior root ganglion). ১

[ব্যবহৃত পরিভাষা—

মস্তিষ্ক—Brain
স্নায়ুতন্ত্র—Nervous system
কেন্দ্রীয়—Central
প্রান্তবর্তী—peripheral
সুষুম্নাকাণ্ড—Spinal cord
লঘু মস্তিষ্ক—cerebellum
গুরু মস্তিষ্ক—Cerebrum
সুষুম্নাশীর্ষক—Medulla oblongata
মস্তিষ্ক স্নায়ু—Cranial nerve
সুষুম্নাস্নায়ু—Spinal nerve
উত্তেজক—Excitatory
নিরোধক—inhibitory
বর্হিমুখী—efferent
পরাবর্ত—reflex
অন্তর্মুখী—afferent
উদ্দীপনা—Stimulation
ললাট অঞ্চল—frontal lobe
রগ অঞ্চল—temporal lobe
শিরকুন্ত অঞ্চল—Parietal lobe
শিরনিম্ন অঞ্চল—occipital lobe

স্বশাসিত স্নায়ু—Autonomic nerve
হিপোক্যাম্পাল অঞ্চল—Hippocampal lobe
মধ্য মস্তিষ্ক—Midbrain
সংবেদনবাহী—Sensory
সমবেদী—Sympathetic
ক্রিয়াবাহী—motor
পরাসমবেদী—Parasympathetic
সমন্বয়—Co-ordination
আন্তরযন্ত্র—Viscera
দেহভঙ্গী—Posture
অনৈচ্ছিক পেশী—involuntary muscle
সাম্যাবস্থা—Equilibrium]

বর্তমানে এই ভাইরাসকে র‍্যাবডো ভাইরাস (Rhabdovirus) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বুলেটের মতো দেখতে এই ভাইরাসটির ধারে ধারে সূচের মতো বেরিয়ে থাকে। যদিও স্নায়ুতন্ত্রকে তাদের বংশবৃদ্ধির সব থেকে সুন্দর স্থান হিসাবে বেছে নেয়, বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে স্নায়ু ছাড়া অন্যান্য কলাতেও এর বংশবৃদ্ধি ঘটতে পারে। খুব সহজেই সূর্যরশ্মি, উষ্ণতা, বিভিন্ন রাসায়নিক যেমন—ফেনল, ফরমালিন, কার্বলিক অ্যাসিড ইত্যাদিতে এই ভাইরাসের ক্ষমতা হ্রাস করা যায়। র‍্যাবডো ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ভালো হয় ৭ দিনের মুরগির ভ্রূণে (chick embryo). এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভ্যাকসিন প্রস্তুতি চলেছে।

কিভাবে রোগ ছড়ায়ঃ (১) কামড়—র‍্যাবিজে আক্রান্ত জন্তু যেমন কুকুর, বিড়াল, শেয়াল ইত্যাদির কামড় থেকে মানুষের শরীরে এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। মানুষের দেহের চামড়ায় এই রোগের ভাইরাস সংস্থাপিত হয়।

(২) চেটে দেওয়া (Licks) কোন ক্ষত বা আঁচড়ের ওপর ঐ ধরনের জন্তু যদি জিভ দিয়ে চেটে দেয় এই রোগ হতে পারে।

(৩) রক্তচোষা বাদুড় (vampire bat) দ্বারা এই রোগ হতে পারে। তবে আমাদের দেশে সে প্রশ্ন আসে না।

রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে কত সময় লাগেঃ ভাইরাস শরীরে

ঢোকার পর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সময়কে বলা হয় Incubation Period। র‍্যাবডোভাইরাস শরীরে ঢুকলে জলাতঙ্ক হওয়ার সময়সীমা সাধারণত ১ মাস থেকে ৩ মাস। তবে এই রোগ দশদিন থেকে এক বছর এমনকি তারও পরে হতে পারে। আর কোন বিশেষ সংক্রামক রোগে এত বেশি সময়সীমা থাকে না। এই সময়সীমা আবার নির্ভর করে (১) কোথায় কামড়েছে, (২) কতটা মারাত্মক কামড়েছে, (৩) শরীরে ঢোকা ভাইরাসের পরিমাণ, (৪) কোন ধরনের জন্তু (৫) কাপড় চোপড়ের ওপর কামড়েছে না উন্মুক্ত জায়গায় কামড়েছে, (৬) প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে কিনা, (৭) রোগী প্রতিষেধক নিয়েছে কিনা, (৮) প্রতিষেধক নিলে তা যথা সময়ে নেওয়া হয়েছে না দেরি হয়েছে ইত্যাদির ওপর।

সময়সীমা কমে যাবে যদি মুখ, মাথা এবং হাতে কামড়ায়, জন্তুটি যদি বন্য হয় এবং কামড়ের সংখ্যা অধিক হয়। মস্তিষ্কের যত কাছাকাছি কামড় হবে এই সময়সীমাও যাবে কমে। ছোটদের ক্ষেত্রে সাধারণত সময়সীমা বড়দের তুলনায় কম হয় অর্থাৎ ছোটদের জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার সময় লাগে কম। ঘাড় বা মাথায় কামড় হলে ভাইরাস মস্তিষ্কে পৌঁছতে সময় লাগে কম আর জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভবনাও থাকে বেশি—হলে হয়ও তাড়াতাড়ি।

সময়সীমা বেশি হবে যদি গৃহপালিত পশু, কমসংখ্যক কামড় ও পায়ের দিকে কামড়ায়। সাধারণত দেখা গেছে—

মাথা, ঘাড় ও মুখ —৩৪ দিন

ঊর্ধ্বাঙ্গে (Upper limb)—৪৬ দিন

নিম্নাঙ্গে (Lower limb)—৭৮ দিন

কোলকাতার পাস্তুর ইনস্টিটিউটের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে দংশনের স্থান থেকেও বেশি নির্ভর করবে কতটা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার ওপর। কুকুরের ডাঃ ভীরা রাঘবন ১৯৭০ সালে তাঁর রিপোর্টে একই মত পোষণ করেছেন।

আর একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে নিম্নাঙ্গে কামড় বেশি (৭২.৮ শতাংশ) উর্ধ্বাঙ্গে ২৩ শতাংশ। শিশুরা উচ্চতায় কম হওয়ায় কুকুরের পক্ষে নাগাল পেতে সুবিধা হয়। বড়দের তুলনায় তাই তারাই আক্রান্ত হয় বেশি।

যতদিন পেরিয়ে যায় এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তত কমে যায়। প্রথম তিন মাসে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি। এক বছর পর এই সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগ এবং ২ বছর পর ধরে নেওয়া যেতে পারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা প্রায় নেই।

ব্যাধিতত্ত্ব: র‍্যাবডোভাইরাস তার প্রবেশ পথের কাছেই থাকে প্রায় পুরোটা সময়। স্থানীয় মাংসপেশীতে বংশবৃদ্ধি করে এবং পরে প্রান্তবর্তী স্নায়ুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতে পৌছয়—এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে। এখান থেকে লালা-গ্রন্থিকে এবং কর্নিয়াকে (cornea) আক্রান্ত করে। আক্রান্ত রোগীর রোগ শুরু হওয়ার আগে তার কর্নিয়ার কোষে র‍্যাবিজ অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়। জীবন্ত অবস্থায় রোগ নির্ণয় করার এটি একটি মূল্যবান পদ্ধতি। আর একটি বিশেষ আণুবীক্ষণিক ব্যাপার হোল নেগ্রিবডি (Negri body)। ১৯০৩ সালে ইটালীর নেগ্রি সাহেব পাগলা কুকুরের মস্তিষ্ককোষের সাইটোপ্লাজমে এক বিশেষ বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন। তাঁর নামানুসারে এই বস্তুর নামকরণ হোল নেগ্রিবডি। এটি মস্তিষ্ককোষে বিশেষত হিপোক্যাম্পাসে দেখা যায় (০.৫ মাইক্রোমিটার থেকে ২০ মাইক্রো মিটার এর ব্যাস।) এছাড়াও লঘুমস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাৎবর্তী কোষ এই ভাইরাসের পীঠস্থান।

মস্তিষ্ককোষে নেগ্রিবডির উপস্থিতি ছাড়া আর বিশেষ কোনকিছুর আণুবীক্ষণিক উপস্থিতি দেখা যায় না। আক্রান্ত কুকুরের শতকরা ৯০ ভাগের মধ্যেই নেগ্রিবডি দেখা যায়। কুকুরটিকে রোগপ্রতিষেধক দেওয়া থাকলে নেগ্রিবডি নাও থাকতে পারে। আর রোগ শুরু হওয়ার

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যদি কুকুরটিকে মেরে ফেলা হয় নেগ্রিবডি থাকার সম্ভাবনা কমে যায়।

পাগলা কুকুর চিনতে হলে : জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষের শতকরা ৯০ ভাগই কুকুর দ্বারা হয়। তাই আক্রমণকারী সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন যাতে শত্রুকে চিনতে অসুবিধা না হয়। আগেই বলেছি পাগলা কুকুর হোল সেইগুলি যেগুলি আগে থেকে র‍্যাবিজ ভাইরাসদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কুকুরের ক্ষেত্রে ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর রোগলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সময় দশদিন থেকে আট মাস পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণত দুসপ্তাহ সময় লাগে। এই সমস্ত কুকুর দুরকম ভাবে দেখা যায়।

উন্মত্ত বা Furious rabies—এই ধরনের কুকুরগুলি আমরা সাধারণত পাগলা কুকুর বোঝাতে যা বলি তাই। এদের চেনা যাবে অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গি, বিকৃত ক্ষুধার লক্ষণ, সামনে যা পাবে তাই খেতে চাইবে তা সে জুতো, বই, টেবিল যাই হোক না কেন এমন কি কিছু না পেলে ইট, মাটি কামড়াতেও কসুর করবে না। বিনা প্ররোচনায় সামনে যাকে পাবে তাকেই কামড়াবে, পরে কামড়ানোর জন্য ক্ষেপে যাবে। কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই ছুটে বেড়াবে। অস্বাভাবিক স্বরে ডাকতে থাকবে। মুখ দিয়ে বিকৃত আওয়াজ বেরোতে থাকে আবার কখনও বা মুখ দিয়ে বিশেষ শব্দ বার করতে পারে না। মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা বেরোতে থাকে—সেই লালা মুখের এককোণে জমতে থাকে। শরীরের ওজন কমে যায়। পেছনের পা ও চোয়ালের পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে। পরে পূর্ণ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে পারে। শেষের দিকে নিশ্বাসের কষ্ট হয়ে দশ দিনের মধ্যে মারা যায়।

মূক বা Dumb rabies—বাড়িতে বা আশেপাশে যদি দেখেন কোন কুকুর চুপচাপ ঝিমিয়ে পড়ে আছে খেতে দিলেও খেতে চাইছে না তাদের অন্য কোন অসুখ করেছে ভেবে অবজ্ঞা করবেন না।

এই সব কুকুরগুলোও জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই শ্রেণীভুক্ত পাগলা কুকুর আমাদের সচরাচর চেনা পাগলা কুকুর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা আচরণও করে বিপরীত। এই সব কুকুরগুলো উন্মত্ত আচরণ করে না, মানুষের চোখের আড়ালে থাকতে এবং তাদের থেকে দূরে থাকতে চায়। তাই এরা ঘরের কোণে, টেবিল বা খাটের তলায় অন্ধকারে আশ্রয় নেয়। কখনো কখনো ঘাড় ও মাথার মাংসপেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। কুকুর চিবিয়ে খেতে পারে না। মূক র‍্যাবিজকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েন তাদের মালিকেরা। কুকুর খেতে পারছে না অসুস্থ হয়েছে মনে করে হয়তো বা ভাবেন গলায় কিছু আটকেছে তাই খাইয়ে দিতে যান তাঁর পোষা জীবটিকে আর তখুনি তাদের দূষিত লালায় দূষিত হয়ে যায় মালিকের হাত।

এই অবস্থায় অনেক কুকুর মালিকের গা চাটতে ভালোবাসে। চাটতে চাটতে যদি কোন ক্ষতস্থানে লালা লেগে যায় তবে ঐ ব্যক্তির জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

কুকুর কামড়ালে কুকুরটি দশদিন লক্ষ্যে রাখা উচিত, তার শরীরে জলাতঙ্কের লক্ষণ দেখা দিয়েছে কিনা। রোগ শুরু হওয়ার চারদিনের আগে তার লালায় রোগের সংক্রামক ভাইরাস থাকতে পারে না এবং রোগ শুরু হওয়ার পর ছ' দিনের বেশি কুকুরটি বেঁচে থাকতে পারে না। তাই মোট দশদিন লক্ষ্য রাখতে হয়। জন্তুটি যদি দশদিন বেঁচে থাকে তবে বুঝতে হবে তার শরীরে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস ছিল না এবং তার কামড় থেকেও এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রয়োজন নেই প্রতিষেধক নেওয়ার, কিন্তু যদি রাস্তার কুকুর হয় বা শেয়াল নেকড়ে ইত্যাদি বন্যজন্তু হয় যাদের আদৌ লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয় সে সব ক্ষেত্রে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই জলাতঙ্ক বিরোধী প্রতিষেধক নেওয়া উচিত। কারণ জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়া মানেই অবধারিত মৃত্যু।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। যাঁরা কুকুর পোষেন

হয়তো দেখলেন মুখ দিয়ে বেশি বেশি লালা ঝরছে, ঢোক গিলতে পারছে না আপনার প্রিয় সারমেয়টি। তখনই ধরে নেবেন না সেটি র‍্যাবিজে আক্রান্ত হয়েছে। অবশ্যই যথেষ্ট সাবধান হবেন এবং পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন কারণ কিছু কিছু কৃমির জন্য (Spirosarca Sanguilata বা Spirosarca Lupi) এই ধরনের লক্ষণ হতে পারে। কুকুরের মল ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষা করলে কৃমি ধরা পড়বে। তাছাড়া ফ্লুরোসেন্ট অ্যান্টিবডি টেষ্টে স্থির নিশ্চয় হওয়া যায় কুকুরটি র‍্যাবিজে আক্রান্ত কিনা।

পরীক্ষাগারে রোগ নির্ণয়ের কিছু পদ্ধতি

রোগলক্ষণ দেখে জলাতঙ্কে আক্রান্ত কিনা দেখার সাথে সাথে কিছু পরীক্ষাগারে রোগ নির্ণয় করার পদ্ধতি আছে। সেই সব পরীক্ষায় স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাবে জীবটি জলাতঙ্কে আক্রান্ত ছিল কিনা।

(১) কুকুরের মস্তিষ্কের স্নায়ু পরীক্ষাগারে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে নেগ্রিবডি দেখা যাবে। আক্রান্ত কুকুরের শতকরা ৯০ ভাগের মস্তিষ্কে এটি দেখা যায় (নেগ্রিবডি সম্বন্ধে আগে আলোচনা হয়েছে।)

(২) সন্দেহজনক জন্তুর মস্তিষ্ককোষ (brain cell) নিয়ে নরম্যাল স্যালাইনে শতকরা দশভাগ দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়। এই দ্রবণ ২০০০ আর. পি. এম (Revolution per minute) এ কেন্দ্রীভূত (Centrifuge) করা হয় পাঁচ থেকে দশ মিনিট। কেন্দ্রীভূত দ্রবণের উপরি ভাগ থেকে ০.০৩ মিলিলিটার নিয়ে কমপক্ষে চারটি ইঁদুরের মস্তিষ্কে ইনজেকশান দেওয়া হয়। ইঁদুরগুলির বয়স তিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে হওয়া চাই। যদি ইঁদুরগুলিতে ৬ থেকে ৮ দিনের মধ্যে র‍্যাবিজের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে বুঝতে হবে সন্দেহজনক প্রাণীটি রোগগ্রস্ত ছিল। দেখা যাবে ইঁদুরগুলি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে এবং ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে মারা যাবে। ইঁদুরের মস্তিষ্কে নেগ্রিবডিও দেখা যেতে পারে।

(৩) ফ্লুরোসেণ্ট অ্যান্টিবডি পরীক্ষা (Fluorescent antibody test)—খুব তাড়াতাড়ি র‍্যাবিজ রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করা যায়। সন্দেহজনক জন্তুটির মাথা আলাদা করে নেওয়া হয়। শতকরা ৫০ ভাগ গ্লিসারিন স্যালাইনে ভেজানো কাপড় দিয়ে মুড়ে নেওয়া হয় মাথাটিকে, পরে গুড়ো করা বরফে ডুবিয়ে রাখা হয়। এর পর লালা গ্রন্থি (Salivary gland) ও মস্তিষ্ককোষ নিয়ে ইমিউনোফ্লুরোসেণ্ট পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানা যায় সন্দেহজনক কুকুরটি জলাতঙ্কে আক্রান্ত ছিল কিনা।

(৪) এতো গেল মৃত জন্তুর পরীক্ষা। জীবন্ত অবস্থায় রোগ নির্ণয় করার পদ্ধতি হল কর্নিয়ার পরীক্ষা (Corneal test)। রোগ শুরু হওয়ার আগেই কর্নিয়ার কোষে র‍্যাবিজ অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়। ফ্লুরোসেণ্ট অ্যান্টিবডি পরীক্ষা দ্বারা কর্নিয়ার এপিথেলিয়ামে র‍্যাবিজ অ্যান্টিজেন-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এই রোগে যারা আক্রান্ত হতে পারে

সমস্ত উষ্ণশোণিত প্রাণীরা এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষ এবং শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হয়। রসায়নাগারের কর্মী যাঁরা এই রোগ ও তার ভাইরাস নিয়ে কাজ করেন, পশুবিদগণ, যাঁরা কুকুর পোষেন বা কুকুর নিয়ে কাজ করেন তাঁদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি থাকে।

সারণি—মোট ২৭৯ জন রোগীর পরিসংখ্যানে দেখা গেছে

বয়স (বছরে)	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতকরা হিসেবে
১—১০	৬৭	৩২	৯৯	৩৫·৪%
১১—২০	৬৮	৫	৭৩	২৬·১%
২১—৩০	৩৩	৯	৪২	১৫%
৩১—৪০	১৪	৪	১৮	৬·৪%
৪০ এর উপরে	৩৫	১২	৪৭	১৬·৮%
	২১৭	৬২	২৭৯	
	(৭৭·৭%)	(২২·৩%)		

(সূত্র—JIMA volume 81—1983)

দেখা গেল পুরুষরাই আক্রান্ত হয়েছেন বেশি যেহেতু বেশি সংখ্যক পুরুষকে বাইরের কাজে বেরোতে হয় তাই। বাচ্চাদের সংক্রমণ প্রতিক্রিয়া বা immune response যথেষ্ট নয় এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এবং প্রাণোচ্ছল শিশুরা কুকুরের পেছনে লাগেও বেশি তাই ছোটরা আক্রান্ত হয় সব থেকে বেশি।

জলাতঙ্ক মানুষে—রোগ লক্ষণঃ এই রোগ শুরুর প্রথম দুচার দিনের মধ্যে শরীর খারাপ, গা ম্যাজম্যাজ করা, সামান্য জ্বর জ্বর ভাব পরে জ্বর বেড়ে ১০০° থেকে ১০১° পর্যন্ত হতে পারে। শতকরা আশিভাগ রোগীর ক্ষেত্রে দংশন স্থানে চুলকায়, কেউ কেউ ব্যাথার কথাও বলেন। পরে স্নায়ুতন্ত্রের সমস্ত বিভাগকে উত্তেজিত করার জন্য কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত্রের আক্রান্ত হওয়ার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী শব্দ সহ্য করতে পারে না, পারে না আলো সহ্য করতে, ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করতেও পারে না। রোগ যতই বাড়তে থাকে লক্ষণ আরো প্রকট হয়। গলাধঃকরণের মাংসপেশীর সঙ্কোচনের ফলে রোগী গিলতে পারে না। কোন প্রকার তরল পদার্থই গেলানো সম্ভব হয় না। পরের দিকে জল দেখে বা জলের শব্দ শুনেও মাংস-

পেশীর সঙ্কোচন হয়। রোগি ভয় পেয়ে যায়। এই বিশেষ ব্যাপারটি কিন্তু জন্তুর মধ্যে দেখা যায় না। এই রোগের প্রকাশ দুতিন দিনের মত থাকে কখনও বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচ ছয় দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। অনেক সময় খেতে গিয়ে রোগী কেঁদে ফেলে।

সাধারণত যে সব লক্ষণ দেখে জলাতঙ্ক রোগী চেনা যায় তাহোল জল খেতে গিয়ে বা দেখে আতঙ্ক (Hydrophobia) ও বায়ুভীতি (Aerophobia)। বাতাসের ঝাপটা রোগী সহ্য করতে পারে না। বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে বা কোনভাবে মুখে বাতাসের ঝাপটা দিলে রোগীর খাদ্যনালীর মাংসপেশী ও ঘাড়ের মাংসপেশীর তীব্র সংকোচন হয়। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পাখা বন্ধ করার আকুতি জানায় সে। রোগ নির্ণয়েয় জন্য কুকুর বা বন্য জন্তুর কামড়ের ইতিহাস থাকবে আর থাকবে রোগের ঐ সব লক্ষণ। শুধু মুখের নয় হাত পায়ের মাংস-পেশীরও খিঁচুনি হয়। আর হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

মানসিক অস্থিরতা, কখনও ঝিমিয়ে পড়ার ভাব থাকে। মৃত্যু হয় কোন একটি তীব্র খিঁচুনি বা পক্ষাঘাতের কারণে। রোগলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু অবধারিত। অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে রোগী দশ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

সারণি

(সূত্র—JIMA vol. 81)

রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া থেকে মৃত্যু হওয়ার ব্যবধান (দিনে)	রোগীর সংখ্যা
১	১০
২	৩৩
৩	১৩৮
৪	৫৬
৫	২২
৬	১৩
৭	৬
৯	২
১০	১

দেখা যাচ্ছে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার তৃতীয় দিনে মারা যাচ্ছে পঞ্চাশ শতাংশ। প্রথম কয়েক দিনেই মৃত্যুর সংখ্যা বেশী। দশদিনের বেশী কাউকেই টিকিয়ে রাখা যায়নি।

জলাতঙ্ক রোগীকে নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

জলাতঙ্ক হওয়া রোগীর রোগ লক্ষণ-এর মধ্যে কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা থাকে। সব রোগেরই বিশেষ বিশেষ লক্ষণ থাকে। যে যে তন্ত্র আক্রান্ত হয় সেই তন্ত্রের লক্ষণই বেশী প্রকট হয়। জলাতঙ্কে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার জন্য তার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এই সব লক্ষণকে ঘিরে আছে নানা ভ্রান্ত ধারণা। বিশেষত যেহেতু কুকুর বা জন্তুর কামড়ের জন্য হয় ঐ সব জন্তুকে জড়িয়ে নানা ধারণা পোষণ করেন অনেকেই।

অনেকেই মনে করেন জলাতঙ্ক রোগীর জলেই কেবল আতঙ্ক। তা নয় আসলে জল খেতে গেলে যেই চোয়াল নাড়ানো হয় মুখের মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে রোগীর মুখের চেহারা আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির মতো হয়ে দাঁড়ায়। আসলে জল ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খেতে গেলেও ঐ রকম আকার হতে পারে। আবার অনেক সময় জল দেখলেও আতঙ্কগ্রস্ত হতে পারে যখন সে ভাবে তাকে জল খেতে হবে অথচ গিলতে পারবে না। এই চিন্তায় ভয় আরো বেড়ে যায়। কিন্তু যদি তার সামনে জল রেখে দেওয়া যায় এবং সে আদৌ কথাটা না ভাবে তবে তার মাংসপেশী ও সংকুচিত হবে না এবং তার আতঙ্কগ্রস্ত চেহারাও দেখা যাবে না। আগেই বলেছি শুধু জল খাওয়ার চেষ্টা নয়, ঠাণ্ডা হাওয়া, তীব্র গন্ধ বা আলো, জোরালো শব্দ ইত্যাদি নানা উত্তেজনাতেই মুখের মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে আতঙ্কিত চেহারা নেয়।

বিকৃত গলার স্বর, কুকুরের ডাক—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্বর যন্ত্রের মাংসপেশীও আক্রান্ত হতে পারে, আর তখুনি

বিকৃত হয় গলার স্বরও। নানা ধরনের আওয়াজ বেরোতে পারে তার মুখ দিয়ে। কখনও বা আওয়াজে কোন প্রাণীর ডাকের সঙ্গে মিল থাকতে পারে। যেহেতু কুকুরে কামড়েছে তাই কুকুরের ডাক ভেবে নেন অনেকে। কিন্তু সে ধারণা যে কতটা ভুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কামড়াতে আসা—অনেকের ধারণা জলাতঙ্ক রোগী নাকি কামড়াতে চায় যাকে পায় তাকেই। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা হয় না। স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজিত অবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর হঠাৎ হঠাৎ সংকোচন হয়। ফলে কখনো রোগীর মুখ হাঁ হয়ে যায়, কখনো বেঁকে যায়, কখনও বা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। মুখ দিয়ে লালাও গড়াতে পারে। এই সব দেখে কেউ কেউ ভেবে বসেন এই বুঝি কামড়াতে চাইছে।

জীবননাশী রোগে সর্বনাশী ওঝাতন্ত্র

প্রাগৈতিহাসিক যুগে চিকিৎসা ছিল সংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ম্যাজিক ও যাদুবিদ্যায় সীমাবদ্ধ। সেই প্রাচীন কাল থেকে ভ্রান্ত ধারণার ওপর নির্ভরশীল অনেক চিকিৎসা পদ্ধতি নানারূপে বিভিন্ন দেশে আজও চালু আছে। মানুষ এখনও কবজ তাবিজ মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি ম্যাজিকী কায়দা ব্যবহার করে। বসন্ত, হাম ইত্যাদি রোগ 'শীতলা ঠাকুরের দয়া' বলে ভাবে। সাপে কামড়ালে মনসার পূজা করে। মনসার রোষ কমাবার ও সাপের বিষ নামানোর জন্য মন্ত্র পড়ে। আদিমযুগের মানুষের ধারা অব্যাহত রেখে আধুনিক সভ্যতার মানুষ আজও অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভর করে আছে। গ্রামাঞ্চলে তো বটেই এমনকি শহরের মানুষও রোগের জন্য 'মানসিক' করে—নির্ভর করে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ওঝা গুণিনদের ওপর যাদের 'চিকিৎসার' কায়দাই হোল ঝাড়ফুক, মন্ত্র, ম্যাজিক ও হাতুড়েপনা, নানা রোগের নানা দাওয়াই বাতলে দেয় তারা। অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ছুটে আসে মানুষ—'সুফলে ফকিরের কেরামতি বাড়ে, অঘটনে কপালের দোহাই পাড়ে।' অকাল মৃত্যু হয় হাজারো অভিমন্যুর। অন্যান্য রোগের মতো জলাতঙ্ক রোগকে ঘিরেও নানা ধরনের বিচিত্র সব বিশ্বাস এবং এই রোগের চিকিৎসার নামে হাবিজাবি নানা পদ্ধতি আজও চলে আসছে। কুকুরের কামড়ে শরীরে 'বিষ' ঢুকেছে কিনা এ সম্বন্ধে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

রোগীর পিঠে আগে থেকে ভিজিয়ে নেওয়া একটি পাতলা হালকা কাঁসার থালা বসিয়ে দেওয়া হয়। যদি থালা কিছুক্ষণ লেগে থাকে

তবে বিষ আছে এবং পরে যখন থালাটি আপনা থেকে পড়ে যাবে তখন 'বিষ শুষে নিয়ে পড়েছে' এই বোঝানো হয়।

জলভরা একটি থালার দিকে তাকিয়ে থাকতে বলা হয়। রোগী যদি নিজের মুখ না দেখে অন্য কারো মুখ বা কোন জন্তুর ছায়া ঐ জলে দেখে তবে বুঝতে হবে শরীরে বিষ ঢুকেছে।

মাটির একটি ভাঁড়ে রোগীর প্রস্রাব নিয়ে তাতে খানিকটা সরষের তেল ফেলে দেওয়া হয়। তেল দেওয়া প্রস্রাবে যদি কুকুর বা কোন জন্তুর আকৃতি ফুটে ওঠে তবে বুঝতে হবে বিষ আছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আরো একটু বিচিত্র ধরনের পরীক্ষার প্রচলন আছে। রোগীকে সাত টুকরো গোমাংস ও সাতটি মাসকলাই দেওয়া হয় এবং বলা হয় জলের দিকে তাকাতে। সে একটি একটি করে মাংসের টুকরো খাবে একটি করে মাষকলাই জলে ফেলবে। সব টুকরো শেষ হওয়ার পর সে যদি কুয়োর জলে নিজের ছবি না দেখে অন্য কোন আকৃতি দেখে তবে বুঝতে হবে বিষ আছে।

চিকিৎসার ব্যাপারেও চালু আছে নানা বিচিত্র সব পদ্ধতি। কোথাও আগাছার ছাল, বিভিন্ন সব পাতা তাও আবার 'মন্ত্রপূত'. কোথাও বিভিন্ন ধরনের সব পোকা খাওয়ানো হয়।

ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে. বিশেষত মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রাম. ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই রোগকে ঘিরে মানুষের বিশ্বাস. তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। দেখেছি এলাকায় এলাকায় ওঝার চিকিৎসা পদ্ধতিও ভিন্ন। পুরুষানুক্রমে এই বিদ্যা তারা মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে চালিয়ে আসছে। অনেকে তাদের এই পৈতৃক ব্যবসার মন্ত্র বা পদ্ধতি জানাতেই চান না—হয়তো ভাত মারা যাবে এই ভয়ে। তুলনমূলকভাবে পুরুলিয়ার আদিবাসী

অঞ্চলে 'সকা'রা তাঁদের সরলতায় কিছুটা খোলসা করেছেন। শিক্ষিত সমাজেও অনেকে গ্রামীণ এইসব চিকিৎসাকে ঐতিহ্যপূর্ণ ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল বলে মনে করেন এবং নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু সেসব ধারণা যে কত ভ্রান্ত এবং কত আজগুবী তা বিভিন্ন ওঝার চিকিৎসার নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে।

সুশান্ত জানা—মেদিনীপুর জেলার মঙ্গলপুর গ্রামের বাসিন্দা। পুরুষানুক্রমে এই রোগের চিকিৎসা করে আসছেন তাঁদের পরিবার। কুকুর কামড়ানো রোগীর শরীরে বিষ আছে কিনা পরীক্ষার জন্য আগে থেকে পুড়িয়ে নেওয়া মাটির ভাঁড় নিয়ে রোগীকে বলেন সকালের প্রস্রাব খানিকটা ঐ ভাঁড়ে ঢেলে দিতে। তাতে খানিকটা সরষের তেল দিয়ে দেখা হয় কোন জন্তুর আকৃতি হচ্ছে কিনা। বিষ থাকলে দংশনকারী জন্তুর আকৃতি দেখা যাবে। বিষ না থাকলে তেল মাটির পাত্রের গায়ে লেগে যাবে।*

এইভাবে রোগ নির্ণয়ের পর শুরু হয় চিকিৎসা—আগেই খবর নিয়ে জেনে নেওয়া হয়েছে দংশনকারী জন্তুটি কি এবং পাগলা কিনা ইত্যাদি। পাগলা কুকুর বা শেয়াল কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু হয়। অন্য জন্তু বা সাধারণ কুকুর হলে এক সপ্তাহ পরে চিকিৎসা।

---

*প্রস্রাবে তেল দিয়ে রোদে বসিয়ে রোগীকে বলা হয় ঐদিকে তাকিয়ে দেখতে কোন জন্তুর ছায়া দেখতে পাচ্ছে কিনা। জলে তেলে যেমন মিশ খায় না আবার তেল জলের ওপর ভেসে থাকে বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে, প্রস্রাবেও তেমনি হয়। এবার এই আকারকে ওঝা-গুণিনের সম্মোহিনী কথাবার্তায় ও রোগীর কল্পনা-প্রবণতায় যে কোন জন্তুর আকৃতি ভেবে নিতে আদৌ কষ্ট হয় না। তেলের ওপর রোদের কিরণ পড়ে আরো চকচকে হয়ে ওঠে। আর চারপাশে উদ্‌গ্রীব দর্শকের ভীড়, আগে থেকে জানা জন্তুটির ছায়া ভেবে নিতে আরো সাহায্য করে। দংশনকারী জন্তু তো বটেই, বাঘ-ভালুক এমনকি পরীক্ষকের ছায়ামূর্তিও ফুটে ওঠা বিচিত্র নয়।)

ওষুধের মাত্রা পাগলা কুকুরের ক্ষেত্রে বাড়বে। চিকিৎসার উপকরণ হোল—(১) কুকুরছাদিয়া গাছের (এক ধরনের বুনো আগাছা) ছাল (২) বুনো ওল (৩) কুচলা গাছের ছাল (৪) এক ধরনের পোকা (লাল রঙের ছোট ছোট এই পোকাগুলিকে উনি এক সঙ্গে সংগ্রহ করে রাখেন। কয়েক বছর পর্যন্ত এই পোকাগুলিকে মৃত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়)।

এই ওষুধ ভোরে মুখ ধুয়ে গরম জলের সঙ্গে খেতে হয়। চিকিৎসাকালীন সাতটি বারণ—ডিম, মাংস, বিউলির ডাল, কলমী শাক, বোয়াল মাছ, তাল ও গুড়। ওষুধ খাওয়ার দিন সকালে চালভাজা গরম জলে ভিজিয়ে খাবে অন্য কিছু খাবে না। খানিকটা ঘোল, দুপুরে ভাত।

নিজ গ্রামের রোগীর ফি উনি নেন না। তবে পীর সাহেবের নামে পাঁচসিকা নেওয়া হয়। সেই পয়সায় বাতাসা কিনে উল্টানো কলাপাতায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় পুকুরে পীর সাহেবের নামে। এটি না করলে নাকি পীর সাহেব স্বপ্ন দেন এবং অভিশাপে নিকট আত্মীয় কাউকে কুকুরে কামড়াতে পারে। দূরের রোগী এলে তার কাছ থেকে পাঁচ দশটাকা ফি হিসাবে নেওয়া হয়। পোষা জীব বা মানুষ সবক্ষেত্রে সমান ফি।

নিজের বাড়ির রোগীর চিকিৎসা করা তাঁর বারণ, তাতে নাকি কাজ হয় না। তাই প্রয়োজনে চিকিৎসক, পশু চিকিৎসকের কাছে তাঁকে পাঠাতে হয়। তাঁর চিকিৎসার ফলাফল নির্ভর করবে চিকিৎসায় বিশ্বাস আছে কিনা তার উপর।

(২) মেদিনীপুরের কাবরা গ্রামের মুক্তেশ্বর বাবুর 'রোগ নির্ণয়ের' সব থেকে 'নির্ভরযোগ্য' পদ্ধতি হোল পিঠে থালা বসানো। একটি হালকা কাঁসার থালার পেছন দিক ভিজিয়ে নেওয়া হয়। থালাটি

এবার রোগীর প্রশস্ত পিঠে মন্ত্র পড়ে বসিয়ে দেন তিনি।* কিছুক্ষণ থালাটি রোগীর পিঠে বসে থাকলে বুঝতে হবে 'বিষ' আছে। তাঁর মতে থালাটি খুলে পড়ার সময় অবশ্যই খানিকটা বিষ শুষে নেয়। থেকে যাওয়া বিষের চিকিৎসার জন্য উনি 'ওষুধ' দেন। কামড়ের পাঁচ থেকে একুশ দিনের মধ্যে যে কোন বিজোড় দিনে চিকিৎসা শুরু হয়। 'ফি' তিনি নেন না। তবে ওষুধের দাম হিসাবে দশ টাকা নেন। গরুর জন্য পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত নেন (টাকা দিয়ে কেনা দামী জিনিস কিনা!) তাঁর নিষিদ্ধ পথ্য হোল—বিউলির ডাল, মিষ্টি, চা, রুটি, কলমী শাক। কি ওষুধ উনি দেন 'মন্ত্র'ই বা কি তাঁর 'ট্রেড সিক্রেট'। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে উনি নাকি হোমিওপ্যাথীর কোন ওষুধ ব্যবহার করেন।

আরো বিচিত্র চিকিৎসা—গঙ্গাজল ও হুঁকোর জল!

একটি ঘটনা

স্টেট্ ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কাজ করেন রমেশ মণ্ডল। বেশ কিছু দিন আগে তাঁকে কুকুরে কামড়েছে, সে সময় তিনি ব্যাপারটাকে বিশেষ আমল দেন নি। তাঁর এলাকায় একজনের জলাতঙ্কে আক্রান্ত

[* থালা বসানোর আগে রোগীর পিঠ টান টান করে প্রশস্ত করতে বলা হয় যাতে থালাটি পিঠে বসার সমতল জায়গা পায়। ফলে বায়ুমুক্ত অবস্থায় (vacuum) থালা কিছুক্ষণ লেগে থাকে। তাছাড়া ভেজানো থালাকে ঘামে ভেজা পিঠ ধরে রাখতে সাহায্য করে। হালকা থালাটি তাই সহজে পড়েও যায় না তবে কোন ক্রমে বাতাস ঢুকে গেলে বা ঘামে ভেজা পিঠ কিছুটা শুকিয়ে গেলে থালা তার নিজস্ব ভারে পড়ে যাবেই। জলাতঙ্কের বিষ তো একটি ভাইরাস। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম এই ভাইরাসের যে থালা ধরে রাখার মতো জোর নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিড়বিড় মন্ত্র নাটকীয়তা ও মন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বাস আনয়নের জন্য। কাঁসা কেন, একটু হালকা ধরনের কোন থালা পাতলা স্টীল বাসন ইত্যাদি যে-কোন সুস্থ মানুষের দেহেও কিছুক্ষণ লেগে থাকবে।]

হয়ে মারা যাবার ঘটনা তাঁকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। নানা জনের পরামর্শে ছুটলেন বিভিন্ন ওঝার কাছে। প্রথমে গেলেন দেউলিহাটের বৈদ্যনাথ মন্দিরে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে পিঠে থালা বসিয়ে রায় দিল বিষ আছে—সুপারিশ করলো তার নির্ধারিত কবিরাজের কাছে ওষুধ নেওয়ার জন্য। পুরোহিত পরিবারের একজনের সে সময় কুকুর কামড়ানোর চিকিৎসা চলছে, তবে ঐ কবিরাজের কাছে নয়—হাসপাতালে ইনজেকশান নিচ্ছে সে। এই ঘটনা রমেশ বাবুর মনে বিশ্বাসের বদলে এনে দিল অবিশ্বাস। এবার অন্যজনের পরামর্শে চললেন রামনগরের হলদিয়া গ্রামে, ওখানে মান্নার বাড়ি পুরুষানুক্রমে এই চিকিৎসায় নাকি সিদ্ধহস্ত। ওখানেও থালা বসিয়ে তাঁকে একটা শিকড় দিল ওঝা। আর দিল ছোট্ট একটা পুরিয়া, পুরিয়ায় খানিকটা কি যেন গুঁড়ো। কিভাবে ওষুধ খেতে হবে সেটি বেশ মজার। রমেশ বাবুকে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করতে হবে না, খানিকটা গঙ্গার জল ও হুঁকোর জল ছাড়া।

প্রথম দিন—একটি গোলমরিচ ও সরবরাহ করা শেকড় গঙ্গাজলে বেটে খেতে হবে।

দ্বিতীয় দিন—খানিকটা গঙ্গাজল ৪ ফোঁটা হুঁকোর জল সহযোগে।

তৃতীয় দিন—সরবরাহ করা পুরিয়ার গুঁড়োর সঙ্গে গঙ্গাজল ও হুঁকোর জল।

চতুর্থ দিন—পুরিয়ার গুঁড়ো ও গঙ্গাজল।

পঞ্চম দিন—পুরিয়ার গুঁড়ো ও গঙ্গাজল।

[গঙ্গাজল কতটা স্বাস্থ্যকর—

গঙ্গাজলের অলৌকিকত্ব নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে নানা ধারণা অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে। গঙ্গা জলের উৎস ও আবির্ভাব নিয়ে যেমন নানান অলৌকিক কাহিনী আছে তেমনি শ্রাদ্ধশান্তি, পূজা পার্বণ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি নানা কাজেতো বটেই এমনকি রোগের চিকিৎসায়

এই জলের ব্যবহার চলে আসছে। গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন, সাপে কাটা মানুষের শব ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা চলে আসছে সেই বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীকাল থেকে। এ ছাড়াও গঙ্গার পাশে দাহ করা অর্ধদগ্ধ শব ভাসিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। শুধুমাত্র বারাণসী থেকে প্রতি বছর প্রায় ৩০০০ অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। হরিদ্বার, কানপুরের ট্যানারির নানা রকম ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ—ট্যানিং করার সময় মৃত পশুর চামড়া থেকে চেছে ফেলা চর্বিমাংসের গতিও সেই গঙ্গা।

পাটনার বিভিন্ন কারখানা থেকে আসা বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত জলের পরিমাণ প্রতিদিন ২৫ মিলিয়ান গ্যালন। কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলকারখানা কেশোরাম রেয়ন ফ্যাক্টরী, ত্রিবেনী টিস্যু, ডানলপ রবার ফ্যাক্টরী, নৈহাটি, টিটাগড় কাগজকল ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে আসা নানা রাসায়নিক পদার্থ ও আবর্জনা গঙ্গায় ফেলা হয়। কোলকাতার সি. এম. ডি. এ এলাকার আবর্জনাবাহী কয়েকশ নর্দমা গঙ্গায় পড়ছে। এ সবের ফলে গঙ্গাজল বয়ে বেড়াচ্ছে রোগের জীবাণু-কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, আমাশা ও বিভিন্ন চর্মরোগের উৎস। ১৯৫৬ সালে বারাণসী থেকে গঙ্গাজলের নমুনা পরীক্ষায় দেখা যায় জলবাহিত রোগের জন্য বেশি অবদান গঙ্গার।

এ জল পান করা দূরে থাক তা স্নানেরও অযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে চাষের কাজেও গঙ্গাজল ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে।

এই গঙ্গাজলের রোগ সারানোর ভূমিকা কি—

কুকুরে কামড়ালে সব ক্ষেত্রে জলাতঙ্ক হয় না, ঐ রোগের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ না করলে জলাতঙ্ক হবে না। প্রতিষেধক হিসাবে দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাসে গঙ্গাজল খেয়ে জলাতঙ্কের আতঙ্ক থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পেয়ে যান রোগীরা। কোন মানুষের জলাতঙ্ক হলে তা কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে হয় না। দীর্ঘদিন পর এক থেকে দু'বছর

সময়ের মধ্যে এই রোগ হতে পারে। তাই যাঁরা আক্রান্ত হন ভুলে যান গঙ্গাজল খাওয়ার কথা বা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেন আর কাকতালীয় ভাবে যে ক্ষেত্রে রোগ হয়না মাহাত্ম্য বাড়ে গঙ্গার।

(সূত্র—দেশ ১২ই এপ্রিল ১৯৮৬)

আর হুঁকোর জল ?—তামাক সাজার সময় হুঁকোর পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বেশ খানিকটা জল। তা সে পুকুর টিউবওয়েল যেখানকারই হোক না কেন বাছবিচার থাকে না তার। এই জলে থাকে অসংখ্য রোগজীবাণু আর যখন তামাক টানার আমেজে এই জল ভুড়ভুড় করে তখন তামাক থেকে নিঙড়ে নেওয়া নিকোটিনে ভরিয়ে তোলে নিজেকে। নিকোটিনের গুণে লালচে রঙ ধরে। বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে এই জল রোগ দূর করতে তো পারেই না বরং রোগ ডেকে আনতে সাহায্য করে।]

পুরুলিয়ার জানগুরু—

পুরুলিয়া জেলা আদিবাসীপ্রধান এলাকা। রাঢ় বাংলার রুক্ষ মাটির দেশ এই জেলা। অনুর্বর কৃষি পদ্ধতি, কোথাও শিল্পের নামগন্ধ নেই এই জেলাতে। কৃষিজমিকে উর্বর করারও নেই কোন ব্যবস্থা। হাজার হাজার একর জমি জলের অভাবে অনাবাদী থেকে যায় এখনও। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বছর খরচ হয় 'আদিবাসী উন্নয়নে'। কিন্তু স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও পুরুলিয়া জেলার এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, নেই কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা। মানবাজার ২নং ব্লক, বাঘমুণ্ডি, অযোধ্যা পাহাড় এরকম বহুস্থান আছে যা পৃথিবীর কোন অংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবে বিচ্ছিন্ন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে যেমন কোন ধারণা নেই তেমনি আধুনিক চিকিৎসার সামান্যতম উপকরণও তাদের কাছে পেঁছায় নি। এখনও চিকিৎসা সংক্রান্ত যা

কিছু ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সব নিজেদের সমাজের বহু পুরানো সংস্কার আবার এই সব সংস্কারই আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের চিকিৎসককে বলা হয় 'সকা' বা জানগুরু। তারা শুধু আদিবাসী শ্রেণীর হবে তা নয় অন্যান্য জাতি এবং বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও অনেকে এ কাজ করেন। জানগুরু সমস্ত ধরনের রোগ সারানোর বিশেষজ্ঞ। বাচ্চার সর্দিজ্বর থেকে শুরু করে কোন মেয়ের বাচ্চা হচ্ছে না কেন সব ব্যাপারেই সিদ্ধহস্ত। এদের সমাজের ধারণা যে কোন রোগ তা কলেরা মহামারী যাই হোক না কেন তার কারণ 'ডাইন' দৃষ্টি দেওয়া। ডাইনের দৃষ্টি পড়লে যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। জলাতঙ্ক রোগেরও কারণ সেই একই—'ডাইন'। কুকুরের কামড়ের পর সকলের ধারণা হয়ে যায় 'ডাইন' কুকুরের রূপ ধরে কামড়াতে আসে এবং কামড়ায়ও। ডাইন বলে সন্দেহ করা হয় সাধারণতঃ বয়স্ক কোন মহিলাকেই।* কোন ব্যক্তি জলাতঙ্কে আক্রান্ত হলে প্রথমে ডাক পড়ে জানগুরু বা সকাকে। এই ব্যক্তি সাধারণতঃ অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় চালাক ও ধুরন্ধর হয়। জলাতঙ্ক রোগীকে আসতে দেখে দূর থেকে দাঁড়িয়ে সকা

---

* [যাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করা হয় গ্রামে তার পক্ষে ও বিপক্ষে দু'টো দল থাকে। কারো মতে সে ডাইনি, কারো মতে সে ডাইনি নয়। এই উভয় দলকে নিয়ে গ্রামের মুখিয়ারা 'সকা' বা জানগুরুর কাছে যায়। জানগুরু যা সিদ্ধান্ত নেবে তার উপর কারো কিছু বলার থাকে না। এদের সবাইকে নিজের খরচে সকার কাছে যেতে হয়। সকা ডাইনি বলে সাব্যস্ত করলে গ্রামের সবাই তখন তাকে কমপক্ষে পাঁচহাজার টাকা জরিমানা করে এবং ওদের সকলের জানগুরুর কাছে যাতায়াতের খরচ দিতে হয়।

পুরুলিয়ার মানবাজার ২নং ব্লক জামতাড়িয়া ইত্যাদি এলাকায় এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। ডাইনি সন্দেহে হত্যার খবর তো আমরা আকছার খবরের কাগজে দেখি।]

'আত্মরক্ষার' ব্যবস্থা করে নেয় যাতে কোন অপদেবতা আক্রমণ করতে না পারে। এই আত্মরক্ষার পদ্ধতিকে গা বাঁধা বলে। মন্ত্র পড়ে—

'শির শিন্দে কাপড় পিন্ধে
বার গাঁইটে বাঁধে
শ্মশানে মশানে যাই
হাতে করি বজ্র কপাটি
স্বর্গ আসিতে স্বর্গ বান্ধি
মর্ত্য আসিতে মর্ত্য বান্ধি
পাতাল আসিতে পাতাল বান্ধি
তিনমুড়ে তিন তেওড়ী
মানুষ-মুখে দিয়া পা
মোর রক্ষা বাঁধছি
চাঁদ মোর খুড়া তা।'

আত্মরক্ষার পর জানগুরু হাতে কয়েকটা সরষে নিয়ে রোগীকে লক্ষ্য করে মন্ত্র পড়ে ও সরষে নিক্ষেপ করে—

'হাতে করি ফুল ঘটি সরিষার বাণ
ষোলশত ডাইন যুগিনের উড়িল পরাণ।'
তুই বিটি ডাইনি তোকেও করিলাম চোর
আর এক বিটি ডাইনি তাকেও করিলাম চোর'।

সরষে নিক্ষেপের পর হাতে একমুঠো ধুলো নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণসহ আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করে—

'কাটি কাটি মন্ত্র কাটি
ভূত প্রেত মড়া মশান ডাইন যুগিন
পলাইতে ত্রিসীমা কার দোহাই
বাধা বড় বাধা লোর সিং
গুরু ধর্মের দোহাই ছাড়ি যাবি এক্ষুনি'।

এরপর হাতে ধুনো নিয়ে ধূনোর ধোঁয়া রোগীর কাছে নিয়ে আসে ও মন্ত্র পড়ে—

'কুলিমুড়া, বটতলা
ষোলশত ডাইনযুগিনের দেবী মেলা
তুই বোন মুই ভাই
গুণ শিখলি একই
তুই শিখলি কাঁদাতে
মুই শিখলি বধাতে

অবশেষে ডাইনের উদ্দেশ্যে শেষ অস্ত্র দোহাই দেওয়া হয়—

'বাধা বড় বাধা লোর সিং
গুরু ধর্মের দোহাই
ছাড়ি যাবি এক্ষুনি'।

এই পদ্ধতি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সব জানগুরুরা এই একই পদ্ধতি এবং সংস্কারে আবদ্ধ। এই পদ্ধতির সঙ্গে 'ওষুধ' ও ব্যবহার করা হয়। সবার ওষুধই 'স্বপ্নে পাওয়া।'

রঘু গোপ একজন জানগুরু—তার চিকিৎসা আড়াইটা গোল মরিচের সঙ্গে নতুন কড়িল্যা গাছের ছাল বেটে একটা ছোলার মতো ভাগ রোগীকে খাওয়াতে হবে। এইভাবে তিন-চার দিন খাওয়ানোর পর রোগীকে দই ও চিড়া খাওয়াতে হয়; রঘু গোপের ধারণা এতে রোগীর পেটে কুকুর বাচ্চা হবে না, এবং রোগী কুকুরের মত ডাক ছাড়বে না।

নরেন্দ্র নাথ গোপ ধুতুরামূলের সঙ্গে আপাং গাছের মূল, প্যাটারী মূল ও সাহাজ ঝাঁটামূল একসঙ্গে দিয়ে তার সঙ্গে চারটে গোলমরিচ মেশান। মিশ্রণে প্রস্তুত জিনিসটি দংশন স্থানে লাগাতে দিয়ে মন্ত্র পড়েন—

'ও ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড়ে
তার বিষ কে টানে
গুহক ঠাকুরে টানে
কার দোহাই
গুহক ঠাকুরের দোহাই।'

এই মন্ত্র নয়বার উচ্চারণ করে বলা হয়। মন্ত্র বলার পর ওপরের 'ওষুধ' একটা নতুন হাঁড়ি ভেঙে সেই হাঁড়ির ভাঙা অংশ দিয়ে লাগানো হয়। বিষ শোধন হয়ে গেলে ভাঙাহাঁড়ি সহ ওষুধ দংশন স্থান থেকে পড়ে যাবে। এই জানগুরুর ধারণা—কুকুর কামড়ানোর পর রোগী যখন জল দেখলে ভয় পায়, অন্য ব্যক্তিকে কামড়াতে বা আঁচড়াতে আসে তখন বুঝতে হবে ঐ দংশন প্রাপ্ত রোগীর পেটে কুকুরের বাচ্চা হয়েছে। তখন চিকিৎসা হোল—সাদা থিয়াসা ফুলের শিকড়ের সঙ্গে সামান্য (সরষে দানার মত) আফিং মিশিয়ে দই-চিড়ার সঙ্গে ঐ ব্যক্তিকে খাওয়াতে হবে। কিছুক্ষণ পরে ঐ ব্যক্তির বমি হবে এবং সমস্ত বিষ বেরিয়ে যাবে। এতেও যদি উপকার না হয়—

শ্বেত আকন্দ, শ্বেত কাড়ালের শেকড় ও সাদা শ্বেত রাবিং একত্র করে শিলে বেটে সামান্য খাওয়াতে হবে। তাঁর মতে এটি একবারে অব্যর্থ ওষুধ।

কিংকর কুইরির চিকিৎসা পদ্ধতি একটু অন্য ধরনের। রোগীর 'পেটে জমে থাকা বিষ' পায়খানা ও বমির সঙ্গে বার করে দিতে হয়। এর পদ্ধতি হোল এক পোয়া সরষের তেলকে মন্ত্রপূত করে খাওয়াতে হবে। খাওয়ানোর অল্প কিছুক্ষণ পরে রোগীর পায়খানা বমি শুরু হলে তাতে বিষ বেরিয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে কয়েক দশক আগে লেখা ডঃ এলউইন-এর 'দি ট্রাইবাল ওয়ার্লড' বইতে পাগলা জন্তু কামড়ানোর ব্যাপারে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঘটনাটি পাঠানগড়ের আদিবাসী অঞ্চলে—"এক রাত্রে একটি পাগলা শেয়াল আদিবাসী গ্রামে ঢুকে সামনে

যাকে পায় তাকেই কামড়ায়। ডজন খানেক গৃহ পালিত পশু কয়েকটি কুকুর এবং সাতজন বারান্দায় শুয়ে থাকা মানুষ কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়। অবশ্যি রাত্রির অবসানে ভোরের প্রথম আলোতেই শেয়ালটিকে মেরে ফেলা হয়। এই ঘটনার বার ঘণ্টার মধ্যেও কেউ তাঁদের কাছে না আসায় তাঁরাও সুযোগ পেলেন না প্রাথমিক চিকিৎসা করার। যখন ওদের ছজনের দেখা পাওয়া গেল এর থেকে উদ্ভূত রোগের সম্ভাবনা ও তার ভয়াবহতা সম্বন্ধে নানা রকম বুঝিয়ে মাত্র তিনজনকে জব্বলপুরে পাস্তুর পদ্ধতির চিকিৎসার জন্য পাঠানো গেল। বাকী তিনজন কিছুতেই যেতে চাইল না, তাদের যাতায়াতের ভাড়া এমনকি দু'সপ্তাহের খোরাকের প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও, তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না, তাদের শরীরে জলাতঙ্কের মতো জীবননাশী রোগের জীবাণু থাকতে পারে। অবশেষে ঐ তিনজন মারাও গেল। তিনি গণ্ড সম্প্রদায়ের এক আদিবাসী রমণীর কথা উল্লেখ করেছেন—ঐ আদিবাসী মা কোলের ছেলেকে শেয়ালের কামড় থেকে বাঁচাতে নিজের হাতকে ক্ষতবিক্ষত করার সুযোগ দিয়েছে শিয়ালটাকে, তবু কিছুতেই ছেলের গায়ে আঁচড় লাগতে দেয় নি। শেয়ালও মনের সুখে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে যতক্ষণ না মায়ের চিৎকারে লোক জড়ো হয়েছে। ঐ বীর রমণীকে কিছুতেই চিকিৎসার জন্য জব্বলপুরে পাঠানো গেল না। নিজেদের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েও রাজী করানো গেল না। আসলে এই সব ব্যাপারে হাসপাতাল না যাওয়ার পেছনে তাদের অমোঘ বিশ্বাস ও দীর্ঘদিনের সংস্কারই দায়ী—"যখন কোন মানুষকে পাগলা কুকুর কামড়ায় ঐ জন্তুর লালা ও মানুষের রক্তের সংমিশ্রণে তৈরি হয় ছোট কুকুর ছানা। ঐ গুলি সংখ্যায় দ্রুত বাড়তে থাকে আর পেটে বাসা বাঁধে। পেট থেকে শিরা দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কয়েক কুড়ি বাচ্চা জন্মে যায় এবং পাঁচ সপ্তাহ পরে সেগুলি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, চিৎকার করে ডাকতে থাকে। সেই ডাকও নাকি শোনা যায়। শেষে ঐ ডাক রোগীর গলা দিয়ে বেরিয়ে

আসে—রোগীও কুকুরের মতো ডাক ছাড়ে বা শেয়াল কুকুরের মতো কাঁদতে থাকে। রোগীর লোকেরা তার হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে জোর করে ওর গলায় বমি করানোর 'ওষুধ' ঢেলে দেয় যাতে ওর বমিতে বেরিয়ে আসে পেটে বাসা বেঁধে থাকা ঐ 'জন্তুর বাচ্চারা'। শারীর বিদ্যাকে জড়িয়ে এই রকম অদ্ভুত সব বিশ্বাস ওদের। 'আদিবাসী বৈদ্যদের' জন্তুবাচ্চা প্রসব করানোর জন্য অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার পাঠানগড়ে নিজের চোখে দেখেছেন ডঃ এলউইন। * গোটাকয়েক গুবরে জাতীয় পোকার সঙ্গে শিউলি গাছের কয়েকটি পাতা বেটে মিশিয়ে তার সঙ্গে গুড় মাখিয়ে 'পিল' তৈরি করে। ঐ পিল রোগীকে দিনে একটা করে খাওয়ালে পায়খানা ও বমি শুরু হয়। দু তিন দিনের মধ্যে এই উপসর্গ দেখা দিলেই প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে ধরে নেওয়া হয়। পুরুষই নাকি বেদনা বেশি অনুভব করে, এবং শীঘ্রই ক্ষুদ্র জন্তুগুলো বেরোতে থাকে। সবাই এগুলো দেখতে পায় না, শুধু-মাত্র বিশ্বাসের চোখ দিয়ে এদের দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে ডাঃ এলউইনও দেখতে পান নি। তাঁকে বলা হয়েছে "জন্তুগুলো লাল পিঁপড়ের মতো দেখতে হয়। ছোট অবস্থায়, শুধু মাথা আর লেজ, যতই বড় হতে থাকে ধড় ও পা তৈরি হয়; সৃষ্টি হয় নেংটি ইঁদুরের

---

* [এই রকম অদ্ভুত বিশ্বাস শুধু আদিবাসী সমাজে নয়, আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা শিক্ষিত মানুষের মনের গভীরেও উঁকিঝুঁকি মারে। তাঁরা নিজেদের মানসিক দুর্বলতা অজ্ঞানতা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভাববাচ্যে অনেক সময় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন। বর্তমান লেখককে প্রশ্ন করা হয়েছিল– "সেদিন যে জলাতঙ্ক হওয়া বাচ্চাটি মারা গেল তার পেটে নাকি কুকুর বাচ্চা হয়ে গেছিল—লোকে সব বলাবলি করছিল, অনেকে তার পেচ্ছাপে ছোট কুকুর বাচ্চা বেরোতে দেখেছে। অবশ্য আমি এসব বিশ্বাস করি না, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সত্যি কি পেটে কুকুর বাচ্চা হয়?" প্রশ্নকর্তা একজন যথেষ্ট শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। শারীর বিজ্ঞানের সামান্যতম ধারণা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন যৌন-মিলন ছাড়া বাচ্চা হওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে কুকুরের কামড়ে বাচ্চা জন্মে যাবে এরকম উদ্ভট, হাস্যকর, মধ্যযুগীয় চিন্তাও মাথায় আসে!]

মতো জন্তুর। জন্তুগুলো বেরিয়ে গেলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে, না হলে সমূহ বিপদ।"

অন্য জানগুরু শক্তিপদ মাহাতোর চিকিৎসায়—একটি জিরা, ডালিমফুল, লিড়িবিসি (এক ধরনের লতানে গাছ) বেটে সরষে দানার মতো অংশ রোগীকে খাওয়াতে হয় এবং আর একটা সরষে দানার মতো অংশ কামড়ের ক্ষতস্থানে লাগাতে হয়। কামড়ের স্থান থেকে লাগানোর 'ওষুধ' যখন পড়ে যায় তখনই বোঝা যায় আর বিষ নেই।

করালী নাগ অপর একজন জানগুরু। তাঁর চিকিৎসায় একটি জিরা ও বাসক পাতাকে মন্ত্রপূত করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানো হয়। করালী নাগ নিজের মুখে খানিকটা সরষের তেল নিয়ে রোগীর ক্ষতস্থানের বিষ মুখ দিয়ে শুষে নেন।

[একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন জন্তুর কামড়ের চিকিৎসায় এই রকম বিপজ্জনক পদ্ধতি চালু ছিল। ঐ সময় আরবের হাকিমরা বিশ্বাস করতেন—"মানুষ কামড়ালেই বিপদ বেশি এবং তা সব চাইতে মারাত্মক। কুকুর, সাপ, বিছে ইত্যাদি যাই কামড়াক না কেন বিষ শরীর থেকে চুষে বার করে নেওয়া উচিত।" তাঁরা করতেনও তাই। দংশিত স্থানের ঘা আর একটু কেটে বাড়িয়ে দেওয়া হোত। মুখ দিয়ে চুষে নেওয়া হোত তার সব বিষ। পরে দংশিত স্থান যদি হাত বা পায়ে হয় তবে ঐ স্থানের ওপরে খুব শক্ত বাঁধন দেওয়া হতো যাতে বিষ উঠতে না পারে। অন্যান্য দেশেও এই ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল—পাগলা কুকুরের কামড় হলে ক্ষতস্থানকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া হোত এবং ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরণ করিয়ে দেওয়া হোত।]

বিজ্ঞানের ক্রমশঃ উন্নতিতে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত শরীরেও সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করা উচিত নয়, তাতে ভাইরাস শরীরের গভীরে সহজে প্রবেশ করে। সুতরাং ক্ষত আরো বাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতিতে জলাতঙ্ক ও কিছু স্ববিরোধিতা

জার্মানীর স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩)-কে হোমিওপ্যাথীর জনক বলা হয়। ১৮১০ থেকে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির প্রচলন শুরু। পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে হোমিওপ্যাথীর প্রচলন থাকলেও ভারতবর্ষেই সব থেকে বেশি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক রয়েছেন এই দাবী করা হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত এলাকায় বিশেষত গ্রামাঞ্চলে হোমিওপ্যাথীর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা করা হয় না, রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

জলাতঙ্কে আক্রান্ত সমস্ত ব্যক্তির লক্ষণ একই রকম হয় না, বিভিন্ন রকম লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসায় তাই সমস্ত ব্যক্তির ওষুধও একই হয় না। রোগীকে দেখে তার লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করা হয়। 'যেসব রোগী বিকারে কামড়াতে যায় বা হঠাৎ ক্ষেপে যায় সে ক্ষেত্রে স্পেন দেশীয় মাছি (Spanish fly) থেকে প্রস্তুত ওষুধ ক্যান্থারিস ভ্যাসিকুলারিস (Cantharis Vesicularis) মহৌষধের কাজ করে।'[১] আর একটি ওষুধ বেলেডোনা (Belladona) কি কান্থারিস কোনটি ব্যবহার হবে তা নির্ভর করবে রোগীর রোগ লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে—"বেলেডোনা রোগীর জল সহ্য হয় না, জল খেতেও চায় না। এক্ষেত্রে মুখের ভাব দেখে প্রভেদ ঠিক করতে হয়। বেলেডোনা রোগীর মুখ টসটসে ও লালবর্ণ, রগ ও কানের মূল দপদপ করবে। ক্যান্থারিস রোগীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ, হরিদ্রাভ, মুখের চামড়া কোচকান, সেই সঙ্গে ভ্রূকুটি যা অত্যন্ত কষ্টব্যঞ্জক এবং প্রস্রাবে কষ্ট ও জ্বালা অনুভূত হয়। বেলেডোনা রোগী অত্যন্ত উগ্র হয়, কখনো রেগে যায়, কখনও কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। জল, চকচকে জিনিস অথবা আয়না দেখলে উপরোক্ত লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।"[২]

সূত্র : ১, ২ মেটিরিয়া মেডিকা, ডাঃ অতুলকৃষ্ণ দত্ত।

ধুতুরার বীজ সুস্থ দেহে প্রয়োগ করলে উন্মত্ততা, তড়কা, জলে আতঙ্ক, প্রলাপ বকা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়—তাই জলাতঙ্ক রোগেও ধুতুরার বীজ ও ফল থেকে প্রস্তুত ওষুধ স্ট্রেমোনিয়াম (Stramonium) ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।[৩]

ডাঃ হেলের মতে 'জলাতঙ্ক রোগে যখন মৃত্যু আসন্ন ২০-৪০ ফোঁটা মাত্রায় ক্যানাবিস মাদার টিংচার প্রচণ্ডতা দূর করিয়া শান্তি আনয়ন করে।' গাঁজা (Canabis Indica) থেকে এই ওষুধের মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

কনক ধুতুরা পাতার ডগার রস, আখের গুড়, খাঁটি গাওয়া ঘি, কাঁচা গো-দুগ্ধ এই চারটি জিনিস প্রত্যেকটি দুই তোলা ওজন একসঙ্গে মিশিয়ে ভোরে খালি পেটে খেতে দিতে হয়। যদি এতে বেশ নেশা হয়, অধিক মত্ততা জন্মায়, বুঝতে হবে বিষ হয় নি। আর অধিক নেশা না হলে, মত্ততা কম থাকলে ঐ দ্রব্য কিছুদিন ধরে খাওয়াতে হবে। যখন বেশ নেশা বা মত্ততা দেখা যাবে বুঝতে হবে বিষ নষ্ট হয়েছে।[৪]

'হোমিওপ্যাথীতে হাইড্রোফোবিনাম ৩x জলাতঙ্কের প্রধান ঔষধ। কুকুরে কামড়াইবার পর প্রথম ২/৪ দিন বেলেডোনা দিয়া পরে হাইড্রোফোবিনাম ৩০ প্রত্যহ ২/১ বার এক সপ্তাহ দিয়া তাহার পর ২/৩ মাস কাল বেলেডোনা ৩x প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করিতে দিবেন।'[৫]

এছাড়া Lady Bug, গুবরে পোকার টিংচার Coccinella Sip ও একপ্রকার গাছ থেকে তৈরি টিংচার Anagalis হোমিওপ্যাথী মতে ব্যবহার-এর কথা জানা গেছে। জলাতঙ্ক রোগী কাচ বা কাচের মত কোন চকচকে জিনিস দেখে ভয় পেয়ে পাগলের মতো হলে "ককসিনেলা" ও "কুকুর শেয়াল কামড়ানোর কিছুদিন পরে রোগী যখন জল বা কোন প্রকার চকচকে বস্তু দেখে ভয়ে প্রায় পাগলের মতো হয় সেই জলাতঙ্ক পীড়ায় এনাগেলিস একটি বহু পুরাতন ফলপ্রদ ঔষধ।"[৬]

৩, ৪, ৫, ৬, কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা, ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ

গ্রীক দেশের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ আছে—কুকুরে কামড়ালে কিছুদিন রসুনের রস ২/৫ ফোঁটা অল্প গরমজলে বা দুধে মিশিয়ে খাওয়া ভালো।[৭]

ষোড়শ শতকের গ্রন্থ ভাব প্রকাশকার কুকুর বিষে বাঁশের শেকড় বা ধলা আকড়ার (Alangium Salvifolium) শেকড় গোদুগ্ধে বেটে ব্যবহার করতে বলেছেন।[৮]

সুশ্রুত সংহিতার কল্পস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে—উন্মত্ত কুকুর ও শেয়ালে কামড়ালে ধুতুরার (**Datura metel Linn**) মূল কাঁচা দেড় গ্রাম, পুনর্নবার (**Boerhaavia Repens**) কাঁচা মূল ৫ গ্রাম একসঙ্গে বেটে ঠাণ্ডা দুধ বা জলের সঙ্গে পান করাতে হবে।[৯]

অথর্ববেদে বলা হয়েছে আপাং বা অপামার্গ গাছের (Achyranthes aspera Linn) বীজ মস্তিষ্কের শঙ্খক রোগ (Encephalitis) দূর করতে পারে। পাতা ও বীজ কুকুরবিষ (জলাতঙ্ক) নাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[১০]

"উন্মত্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতি জীবে দংশন করিলে ক্ষতস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব এবং সেই স্থানের স্পর্শশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে। শরীরে সেই বিষ বেশিদিন অবস্থিত থাকিলে, ক্রমে ক্রমে জ্বর হয় এবং পরিশেষে রোগী উন্মত্তবৎ হইয়া দংশক জীবের ন্যায় রব ও তাহার কার্যাদির অনুকরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ রোগী জলে বা দর্পণে দংশক জীবের রূপ দেখিতে পাইলে, কিংবা জল দেখিয়া অথবা জলের নাম শুনিয়া ভয়প্রাপ্ত হইলেও, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উন্মত্ত শৃগালাদির বিষ বহুদিন পর্যন্ত অনেকের শরীরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, দংশনের এক বৎসর বা দুই বৎসর পরেও অনেকের উন্মাদ ও জলত্রাসাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া, মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে।"[১১]

সূত্র ৭, ৮, ৯, ১০, চিরঞ্জীব বনৌষধি, আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য

১১, কবিরাজি শিক্ষা, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'কবিরাজি শিক্ষা' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের বিষ চিকিৎসা অধ্যায়ে 'উন্মত্ত শৃগালাদির দংশন বিষ' বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনা করেছেন। তিনি দংশন পরবর্তী চিকিৎসায় নির্দেশ দিয়েছেন—"উন্মত্ত কুকুর বা শৃগালে দংশন করিলে, দষ্টস্থান চিরিয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব করাইবে। পরে সেই স্থানে অগ্নিক্ষার অথবা উষ্ণ ঘৃত দ্বারা দগ্ধ করিবে এবং পুরাতন ঘৃত পান অথবা ধুতুরার মূল কিংবা কুচিলা এক বা দুই রতি পরিমাণে সেবন করাইবে।"

"কুকুরে কামড়াইলে শিরীষবীজ মনসাসীজের ক্ষীরে ঘষিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ প্রলেপ দিবে এবং ধুতুরা পাতার রস, ঘৃত, গুড় ও দুগ্ধ—প্রত্যেকটির দুই তোলা একত্র করিয়া অথবা ধুতুরামূল চারি আনা বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করাইবে। এই নিয়মে ১০/১৫ দিন ঔষধ সেবন করান কর্তব্য।"[১২]

প্রাচীনকালে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সব ওষুধের ব্যবহার হোত তা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। গাছ-গাছড়া ও প্রাকৃতিক নানা বস্তু থেকে আহরণ করা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ওষুধ কার্যকারিতা অর্জন করেছিল যার অনেক কিছুই হয়তো আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত ও উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা না হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদও টোটকার পর্যায়ে চলে গেছে। কুকুরে কামড়ালে "সীজের আঠায় শিরীষবীজ ঘষিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিবে এবং শিরীষবীজ বাটিয়া তাহার মধ্যে মেষলোম পুরিয়া সেবন করাইবে।"[১৩]

অনেকে মনে করেন ওঝারা যেসব গাছ-গাছড়া ও অন্যান্য দ্রব্য ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে তা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ সুতরাং তাও ঐতিহ্যপূর্ণ এবং কার্যকরী। তাঁরা বলেন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তার প্রয়োগ ও কার্যকারিতা নাকি প্রমাণিত এবং ঐ সব প্রত্যেকটি

১২, আয়ুর্বেদ শিক্ষা, কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত

১৩, কবিরাজি শিক্ষা, নগেন্দ্রনাথ সেন

জিনিসের বিশেষ বিশেষ দ্রব্যগুণ আছে। তাঁরা এও বলেন প্রচলিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার ধারাও অভিজ্ঞতার নিরিখে চলে আসছে। তাই ঐ সব লোক-চিকিৎসা আদৌ অবহেলার নয়। ঐ সব তথাকথিত লোক-চিকিৎসায় ব্যবহৃত দ্রব্যের গুণ হয়তো কিছু আছে তবে যেভাবে তা ব্যবহার করা হয় তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং বেহিসেবী। অনেক জায়গায় একই রোগের চিকিৎসায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্রব্যের ব্যবহার বিভিন্ন। এখানে যেমন পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে তেমনি আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথী ও গ্রামীণ লোক-চিকিৎসায় ওষুধের ব্যবহারে কিছু আপাত মিলও দেখা যায়।

আয়ুর্বেদের কিছু পদ্ধতিতে মধ্যযুগের ধারা লক্ষণীয়—"উন্মত্ত কুকুর বা শৃগালে দংশন করিলে দষ্টস্থান চিরিয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব করাইবে।" মধ্যযুগে আরবে দষ্টস্থানে ক্ষত সৃষ্টি করে রক্তপাত ঘটানোর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সভ্যতার আদিযুগে মনে করা হোত মানুষের রোগ দেবতার অভিশাপ বা অপদেবতার কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণটা যখন অলৌকিক তখন চিকিৎসাও হোত মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে। ঋকবেদে যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসায় মন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তখনকার সময়ে যক্ষ্মা-রোগের মতো মারাত্মক রোগে মন্ত্রের বেশি হয়তো ভাবা সম্ভব ছিল না, কারণ তখন যক্ষ্মারোগের জীবাণু বা তার প্রতিষেধের ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু জলাতঙ্ক রোগের কারণ ও তার প্রতিষেধক আবিষ্কারের একশ বছর পরেও এই রকম মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার আদিযুগীয় অজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রোগীর মনে বিশ্বাস আনয়নের জন্য চিকিৎসককে কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখাতেই হয়, তাই বোধহয় তৎকালীন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ, এবং এই ধারা আজো চলে আসছে।

ওঝাদের ব্যবহৃত দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র কি বলে দেখা যাক—ডালিম ফুল রক্তস্রাবনাশক ও কফঘ্ন। বাসকপাতা

বসন্ত ইত্যাদি রোগে ব্যবহারের উল্লেখ থাকলেও, কোথাও কুকুরবিষে ব্যবহারের উল্লেখ নেই। আয়ুর্বেদের দ্রব্যগুণে বিছে কামড়ালে কামড়ের ওপর জিরে (Cuminum cyminum Linn) বেটে ক্ষতস্থানে লাগালে উপশম হয় এবং বমি, ক্ষয়রোগ, কৃমিরোগ, রক্তদুষ্টি ইত্যাদিতে ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। কুচিলা (Strychnos nuxvomica Linn) একটি বিষবৃক্ষ। 'এর ফল স্বাদে তিতা, ঝাঁঝালো গন্ধ ও বিষাক্ত। এটি ক্ষুধা ও বলবর্ধক, কফবাত প্রশমক ও বেদনানাশক এবং কুকুর-বিষজনিত উন্মাদনাশক।' শ্বেত আকন্দকে (Calotropis gigantea) 'শ্বেতার্ক, শ্বেতপুষ্প, অলর্ক ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়। শ্বেত ও রক্ত এই উভয়বিধ আকন্দই সারক এবং বায়ুকুষ্ঠ, কণ্ডুবিষ, কফ ও ক্রিমি বিনাশক।' আফিং (Opium) 'কফনাশক, পিত্তকারক, আক্ষেপ-নিবারক, নিদ্রাজনক ও বেদনা প্রশমক।' শিউলিফুল (Nyctanthes arbortristis) 'বাত, ক্ষয়রোগ, অঙ্গ ও সন্ধিগত বাতরোগ এবং আপান বায়ুনাশক।'

দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত দ্রব্যের কয়েকটি কুকুর কামড়ালে বা 'বিষ নাশক' হিসাবে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রীরা। কয়েকটি কীট-পতঙ্গের কামড়ের জন্য ব্যবহার করার কথা বলেছেন। তাঁরা প্রত্যেকটি দ্রব্যের ব্যবহারে মাত্রাও ধার্য করে দিয়েছেন। শুধু পাশ্চাত্য মতের ওষুধে প্রতিক্রিয়া হয়, গাছ-গাছড়ার কোন প্রতিক্রিয়া নেই তা নয়। মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে 'বিষক্রিয়া' হবে এ মত কয়েকজন বিশিষ্ট কবিরাজের। সুতরাং আয়ুর্বেদ ও তথাকথিত লোক-চিকিৎসার মধ্যে কিছু আপাত সম্পর্ক থাকলেও যথেষ্ট পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে।

আবার কুচিলার ফল আয়ুর্বেদে 'কুকুরবিষজনিত উন্মাদনাশক' অথচ হোমিওপ্যাথীতে Nuxvomica-র এই রোগে ব্যবহারে যেমন কোন উল্লেখ নেই, তেমনি ধুতুরার বীজ 'কুকুরবিষজনিত রোগে'

আয়ুর্বেদে ব্যবহারের নির্দেশ আছে—উল্লেখ আছে ধুতুরা থেকে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ stramonium-এ ও।

আর একটা মজার ব্যাপার হোমিওপ্যাথীতে Spanish fly থেকে ও গুবরে পোকা থেকে প্রস্তুত ওষুধ জলাতঙ্কে ব্যবহারের নির্দেশ আছে; এবং '৭ দিন কলার ভিতর ৭টি শিমুল বীচি পুরিয়া'[১৪] খেতে দেওয়ার উল্লেখ আছে। গ্রামে ওঝাদের দ্বারা কলার ভেতর পোকা পুরে খাওয়ানো ও ডাঃ এলউইনের হাজারীবাগে আদিবাসীদের কাছে দেখা গুবরে পোকা খাওয়ানো কি সম্পর্কযুক্ত? এ সম্পর্কের উৎস গবেষণার বিষয়।

ভ্যাকসিন প্রবর্তনের আগে কবিরাজরা এই রোগের প্রতিষেধে বা চিকিৎসায় তাঁদের উল্লেখিত দ্রব্য ব্যবহার ক'রে জানিনা কোন সুফল পেয়েছেন কিনা। তবে ইদানীং কবিরাজরা সন্দেহজনক ক্ষেত্রে হাসপাতালে যাওয়ার এবং প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। কয়েকজন বিশিষ্ট কবিরাজের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি তাঁরাও পাশ্চাত্য চিকিৎসার ক্রমকে অনুসরণ করার পক্ষে, বিশেষত যখন আয়ুর্বেদে উল্লিখিত দ্রব্যের কোন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হয়নি। আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে যেকটি প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন—ডাবর, ঢাকা, সাধনা, বৈদ্যনাথ ইত্যাদি নামকরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মাত্র কয়েকধরনের আয়ুর্বেদ ওষুধ প্রস্তুত করে। সরকারী আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান মাত্র কয়েক রকমের ওষুধ তৈরি করে বলে জানা গেছে। আর আয়ুর্বেদ চালু আছে বিভিন্ন কবিরাজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে, মূলত তাঁদের পরিবার কেন্দ্রিক। তাঁরা নানা ধরনের ওষুধ তৈরি করলেও জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার বা প্রতিষেধক হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠান কোন ওষুধ তৈরি করেন বলে জানা যায়নি।

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন—'কুকুরে কামড়ালে পাশ্চাত্য চিকিৎসার ক্রমকে মানতে হবে।'[১৫]

১৪, কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা, ডাঃ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
১৫, চিরঞ্জীব বনৌষধি, আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য

হোমিওপ্যাথী ওষুধ হাইড্রোফোবিনাম জলাতঙ্কের ভাইরাস থেকে প্রস্তুত বলা হয়। কিন্তু জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক হিসাবে এর তো ব্যাপক ব্যবহার দেখি না।

হোমিওপ্যাথী বা আয়ুর্বেদে উল্লেখিত এই রোগের ওষুধের ব্যবহারিক গুণ হয়তো কিছু থাকতে পারে। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে হয় নি কোন গবেষণা, হয় নি বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষা। তাই ঐসব ওষুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আদৌ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বিশেষত এই রকম জীবননাশী রোগের ক্ষেত্রে যার পরিণতি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা

আবার অভিমন্যুর কথায় আসি। বেশ কয়েকদিন পরে অভিমন্যু স্থানীয় সমাজকর্মী মাধব দিণ্ডার পরামর্শে আমার কাছে এল কামড়ের ইতিহাস নিয়ে। জলাতঙ্কের ভাইরাস তখন গোপনে তার শরীরের প্রতিটি রক্ত-কণিকাকে দখল করে চলেছে, কিন্তু বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে জলাতঙ্কের চক্রান্ত আবিষ্কার করা যাচ্ছিল না। সেই জীবননাশী রোগের কোন লক্ষণ তখন তার শরীরের বাইরে প্রকাশ পায় নি, কিন্তু সেই একই কুকুর অন্যকে কামড়েছে এবং মরেও গেছে। শুরু হোল ভ্যাকসিন দেওয়া। তখন বারবার মনে হচ্ছিল অভিমন্যু আর একটু আগে এলে বড় ভালো করত, কিন্তু একবারও মনে হয় নি যে সে তখন জলাতঙ্কের নষ্ট থাবার আয়ত্তে এবং চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক চিকিৎসা হোল জলাতঙ্ক রোগ বিরোধী ভ্যাকসিন দিয়ে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা। অন্যান্য রোগে ব্যবহৃত ভ্যাকসিনের তুলনায় এটি অনন্য, কারণ শরীর যখন রোগের কাছে একেবারে উন্মুক্ত তারপরেই এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। জীবননাশী এই রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হোল এই ভ্যাকসিন। যদি জন্তুটি এবং তার কামড় সন্দেহজনক হয় সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাকসিন চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া দরকার, কোন ক্রমেই দেরি করা উচিত নয়। এই রোগে প্রান্তবর্তী স্নায়ু (Peripheral nerve) আক্রান্ত হয়ে তার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় স্নায়ু আক্রান্ত হয়। তাই যত তাড়াতাড়ি প্রান্তবর্তী স্নায়ুতে যাতে ভাইরাস জমতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, দরকার শরীরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জীবাণু, জীবাণুজাত প্রতিবিষ, ভাইরাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিকে বলা হয় Immunity বা অনাক্রম্যতা।

ল্যাটিন শব্দ immunis কথার অর্থ রেহাই পাওয়া। দেহে প্রবেশ্য এই সব ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, বিজাতীয় পদার্থ ইত্যাদি হোল অ্যান্টিজেন। এদের উপস্থিতিতে দেহের মধ্যে যে প্রোটিনের আবির্ভাব ঘটে তাদের বলা হয় অ্যান্টিবডি। রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মানুষের শরীরে জন্ম থেকে এক ধরনের ক্ষমতা গড়ে ওঠে (স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা) আবার কখনও বিশেষ বিশেষ রোগে যেমন ডিপথেরিয়া, বসন্ত, হুপিং কাশি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে সেই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতা অর্জন করে মানুষ। আবার মৃত জীবাণুকে দেহে প্রবেশ করিয়ে, রূপান্তরিত প্রতিবিষ বা অর্ধমৃত জীবাণুকে দেহে ঢুকিয়ে অর্জন করানো হয় প্রতিরোধ ক্ষমতা (অর্জিত অনাক্রম্যতা)। এই সব জীবাণু শরীরে প্রবেশের ফলে দুরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রক্তে অনাক্রম্য গ্লোবিউলিনের আবির্ভাব ঘটে এবং লসিকা কোষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ঘটে। এরা নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রতি সংবেদনশীল হয় এবং সরাসরি তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্জিত অনাক্রম্যতা দুরকমের হয়—(১) সক্রিয় অনাক্রম্যতা (active immunity) (২) সহিষ্ণু অনাক্রম্যতা (passive immunity)

অ্যান্টির‍্যাবিজ ভ্যাকসিন—জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, এই রোগ-বিরোধী ভ্যাকসিনের সাহায্যে। এই ভ্যাকসিন একটি পূর্ণ কোর্স দেওয়ার পর ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে সক্রিয় প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে। জলাতঙ্ক প্রতিষেধক আগে থেকে র‍্যাবিজ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়া ভেড়ার মস্তিষ্ক থেকে তৈরি করা হয়। সংক্রমিত মস্তিষ্ক কলা ৫% ফসফেট বাফার-দ্রবনে সম্পৃক্ত করা হয়। অ্যান্টির‍্যাবিজ ভ্যাকসিন যখন গ্রহীতার শরীরে দেওয়া হয় ভ্যাকসিনের মৃত র‍্যাবিজ ভাইরাস অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে এবং জলাতঙ্ক বিরোধী অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করে।

রোগ প্রতিষেধের আর একটা পদ্ধতি হলো অনাক্রম্য সিরাম অর্থাৎ এই সিরাম এমন একটা প্রাণী থেকে নেওয়া হয় যে প্রাণী একবার ঐ রোগ থেকে আক্রান্ত হয়ে সেরে উঠেছে ও তার ফলে তার শরীরে জন্মে গিয়েছে ঐ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। এই সিরাম কোন ব্যক্তির শরীরে ইনজেকশান দ্বারা প্রবিষ্ট করানো হয় এবং এই ভাবে তার শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়।

পাস্তুর দেখলেন একটি খরগোশ থেকে অন্য খরগোশে যখন ভাইরাসকে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে তার চরিত্রে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ভাবে তিনি বারবার স্থানান্তরিত করে দেখলেন ভাইরাসের ক্ষতি করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এই ভাবে ২০ বা ততোধিকবার স্থানান্তরিতকরণের ফলে ভাইরাসকে স্থির (fixed) করা গেল।

পাস্তুর জলাতঙ্ক প্রতিষেধক আবিষ্কার করে গেলেন। তাঁর প্রবর্তিত ভ্যাকসিন ছিল জীবন্ত ভাইরাস ভ্যাকসিন। সে সময়ে এটাই ছিল জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হাতিয়ার। দীর্ঘদিন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পাস্তুরের উত্তরসূরীরা চেষ্টা চালিয়ে গেছেন একে আরো কম ক্ষতিকারক ও বেশি কার্যকরী করে আরো ভালোভাবে কি করে মানুষের কাজে লাগানো যায়। স্নায়ুকোষ থেকে প্রস্তুত ভ্যাকসিনে অন্তর্মুখী স্নায়ুর পক্ষাঘাতকে এড়াতে নানা রকম গবেষণা চলল। চলল স্নায়ু ভ্যাকসিনের বিকল্প কিছু প্রতিষেধক তৈরি করার চেষ্টা যাতে র‍্যাবিজ ভাইরাস ও পূর্ণমাত্রায় আকাঙ্ক্ষিত অ্যান্টিজেন থাকবে, থাকবে না বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিকগুলো। ত্রিশ-দশকের শেষে দেখা গেল বাড়ন্ত মুরগীর ভ্রূণে র‍্যাবিজ ভাইরাস জন্মানো যায়, এর কলাকে ভাইরাসের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। চল্লিশ-দশকের শেষা-শেষি এই কলা থেকে ভ্যাকসিন প্রস্তুত করাও সম্ভব হোল। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকায় বাড়ন্ত হাঁসের ভ্রূণ (develop-

ing duck embryo) থেকে ভ্যাকসিন প্রস্তুত হোল। এই ভাবে প্রয়োজনের তাগিদে উন্নততর ভ্যাকসিন প্রস্তুতি চলল।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭৩ সালে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য এই রোগের প্রতিষেধকের ক্ষেত্রে বিশেষ সুপারিশ করেছেন—তাঁরা বলেছেন এই ভ্যাকসিনে যেন প্রশমিত (inactivated) ভাইরাস থাকে।

ভ্যাকসিন বর্তমানে যে যে ভাবে পাওয়া যায় তা হোল স্নায়বিক কলা ভ্যাকসিন (Nerve Tissue Vaccine)—যা বহুল ব্যবহৃত A. R. V. (অ্যান্টির‍্যাবিজ ভ্যাকসিন)। এই ভ্যাকসিন প্রস্তুতিতে প্রথম পর্যায়ে পিটমুর ভাইরাস স্ট্রেন (PV—II)খরগোশে স্থিত করানো হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ থেকে দশ কিলোগ্রাম ওজনের কয়েকটা স্ত্রী ভেড়া নেওয়া হয়। স্ত্রী ভেড়ার শিং থাকে না তাই মস্তিষ্কে ভাইরাস প্রবেশ করানো সুবিধাজনক হয়। শিংহীন পুংভেড়াও এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। দেখতে হবে ভেড়াগুলি যাতে সুস্থ হয়, তাদের কোন রোগ না থাকে। চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করে দেখে নিতে হয় রোগাক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকলো কিনা। সেই ভেড়াগুলির মস্তিষ্কে খরগোস মস্তিষ্কস্থিত ভাইরাস প্রবেশ করানো হয়। এবার ভেড়াগুলিকে পরীক্ষা করার পালা। পাঁচ থেকে সাত আট দিনের মধ্যে ভেড়ার মধ্যে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের শরীরের পরিবর্তন। এরপর ভেড়াগুলিকে মেরে ফেলা হয় এবং তাদের মস্তিষ্ক আলাদা করা হয়। এই রোগগ্রস্ত মস্তিষ্ককে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেনল ও পাতিত জলের দ্বারা নির্দিষ্ট মাত্রায় দ্রবীভূত করা হয়। দেখা হয় জীবাণুমুক্ততা, ভাইরাসের প্রশমন ক্ষমতা, পি. এইচ ইত্যাদি এবং নির্ভরযোগ্য ভ্যাকসিন হিসাবে ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ইদানীং দেখা গেছে উষ্ণতা এবং ফেনল-এর ব্যবহার-এর তুলনায় শীতলতা এবং বিটা প্রপায়োল্যাকটোন দিয়ে প্রশমিত করা ভ্যাকসিন অনেক বেশি কার্যকরী।

চিক এমব্রিও ভ্যাকসিন (Chick Embryo Vaccine)

এই ভ্যাকসিনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্নায়বিক কলা ভ্যাকসিনের তুলনায় অনেক কম। তাই প্রাথমিক প্রতিষেধক হিসাবে এর ব্যবহার সুপারিশ করা হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়, যেমন যাঁরা স্নায়বিক কলা ভ্যাকসিন ব্যবহার করে নানা রকম প্রতিক্রিয়ার কবলে পড়েছেন এবং স্নায়বিক কলা ভ্যাকসিন বন্ধ করা হয়েছে।

যাঁদের আগে কখনো এই ভ্যাকসিন নিয়ে স্নায়বিক দুর্বলতায় ও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস আছে এবং পুনরায় ভ্যাকসিন নেওয়া প্রয়োজন তাঁদের ক্ষেত্রে ও যাঁদের ডিমের প্রোটিনে অ্যালার্জি আছে তাঁদের এই ভ্যাকসিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রশমিত ডাক এমব্রিও ভ্যাকসিন (Inactivated Duck Embryo Vaccine)—১৯৫৬ সালে এই ভ্যাকসিন বিটা প্রপায়োল্যাকটোন দ্বারা (BPL) প্রশমিত করে চালু করা হয়েছে। আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশে ব্যাপক ব্যবহারও হয়েছে। কুকুর কামড়ানোর আগে ও পরে ব্যবহৃত ভ্যাকসিন হিসাবে খুব সামান্যই ভাইরাস বিরোধী অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে পারে। এই ভ্যাকসিনে চিকিৎসা করে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ডাক এমব্রিও ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ নিরাপদও নয়। এর থেকে অন্তর্মুখী স্নায়ু পক্ষাঘাতের নজিরও অনেক আছে। মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের পক্ষাঘাতের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তবে স্নায়ু ভ্যাকসিনের তুলনায় এর সংখ্যা অনেক কম। এর আরো কিছু অসুবিধার দিক

Purified chick-embryo cell Rabies Vaccine বোম্বে ইত্যাদিতে চালু ছিল। বর্তমানে HOECHST কোম্পানী RABIPUR বাণিজ্যিক নামে টিস্যু কালচার ভ্যাকসিন বাজারে ছেড়েছেন। এই মর্মে তাঁরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচারও করেছেন। এই ভ্যাকসিনে ৬টি ইনজেকশন নিতে হয়। প্রতি ডোজ প্রায় ১২০ টাকা হিসাবে মোট ৭২০ টাকা খরচ পড়ে এই ভ্যাকসিনে।

আছে যেমন ২৩টি ইনজেকশান নিতে হয়, এবং প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ডিমে অ্যালার্জি থাকলে এই ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না। ১৯৭০ সালের ল্যানসেট পত্রিকায় একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে এই ভ্যাকসিনের খুব একটা কার্যকারিতা নেই।

কি ধরনের ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হবে—জন্তুর কামড়ের চিকিৎসার জন্য কি ধরনের ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হবে তার সিদ্ধান্ত নিতে হয় চিকিৎসককে। যেসব ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন ব্যবহার করা অবশ্যই প্রয়োজন সেক্ষেত্রে স্নায়ু ভ্যাকসিন এবং ডাক এমব্রিও ভ্যাকসিনের মধ্যে বেছে নিতে হবে যে-কোন একটিকে। কারণ এক্ষেত্রে চিক এমব্রিও ভ্যাকসিনের কথা ওঠে না—যেহেতু প্রাথমিক প্রতিষেধক হিসেবে তার বিশেষ মূল্য নেই। এই তিন ধরনের ভ্যাকসিনের মধ্যে স্নায়ু ভ্যাকসিনই গ্রহণযোগ্য—তার জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে সক্রিয়, প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী ভূমিকার জন্য। এটি শুধু যে উচ্চতর অ্যান্টিবডি তৈরি করে তা নয়, ডাক এমব্রিও ভ্যাকসিনের তুলনায় যথেষ্ট চটপট করে ফেলে। মারাত্মক অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কামড়ের ক্ষেত্রে স্নায়ু ভ্যাকসিন ব্যবহার করাই শ্রেয়, যদি রোগীর কোন প্রতিক্রিয়া না হয়। চিক এমব্রিও ভ্যাকসিন কোন মতেই প্রাথমিক প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্যক্তি বিশেষ, যাদের স্নায়ু ভ্যাকসিনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার যাদের স্নায়ু ভ্যাকসিন ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়ার জন্য মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয়েছে এমন ক্ষেত্রে বা আগে স্নায়ু-পক্ষাঘাতের ঘটনা ঘটেছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সব দিক বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক হিসাবে, স্নায়ু ভ্যাকসিনই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। আবার এই ভ্যাকসিনের মারাত্মক জটিল প্রতিক্রিয়া আছে। এইসব অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি এড়াতে হলে সর্বাগ্রে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন, কোন্ কোন্

ক্ষেত্রে প্রতিষেধক দেওয়া একান্ত জরুরী তা সিদ্ধান্ত নেওয়া। আবার দেরি করে চিকিৎসা করাও বিপজ্জনক। তাই সন্দেহজনক ক্ষেত্রে চিকিৎসা সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অনেক সময় বিভিন্ন রোগীরা নানা প্রশ্নে ডাক্তারদের বিব্রত করে তোলেন। জলাতঙ্কের আতঙ্কে তাঁরা এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে সুস্থ কুকুর কামড়ালে, এমনকি কুকুর যদি দশদিনের বেশি বেঁচে থাকে তবুও তাঁরা ডাক্তারকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন ইনজেকশান দেওয়ার জন্য। তাঁরা এই ভ্যাকসিনের জটিল পরিণতির কথা অনেক সময়ই বুঝতে চান না। বিশেষত গ্রামে বা বিশেষ কোন অঞ্চলে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন সেই ভীতি আরো বেশি করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন আগেকার কুকুর কামড়ানো বা আঁচড়ানোর ইতিহাস তাঁদের মনে পড়ে যায়, ছুটে আসেন ডাক্তারের কাছে। স্নায়ু পক্ষাঘাত হওয়া মানেই নতুন প্রতিবন্ধী সৃষ্টি হওয়া। সেই ব্যক্তি তখন তার পরিবার এমনকি সমাজের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে যেখানে বছরে হাজার হাজার রোগী কুকুর বা জন্তুর কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন সেখানে পাগলা কি স্বাভাবিক জন্তু তফাৎ না করে, চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কি নেই না দেখে, যদি সবাইকে এই চিকিৎসা করা হয় তবে প্রতি বছরে ভ্যাকসিন নেওয়া রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে, সেই সঙ্গে বাড়বে ভ্যাকসিন-সৃষ্ট প্রতিবন্ধীর সংখ্যাও। বৃহত্তর সমাজের কাছে এটা মোটেই নিরাপদ ও আকাঙ্ক্ষিত নয়। যাই হোক কোন ব্যক্তি যখন জন্তুর কামড় খেয়ে চিকিৎসার জন্য আসেন তাঁর চিকিৎসা করা হবে কিনা বা কি ধরনের চিকিৎসা হবে, নির্ভর করবে সেই জন্তুর গতি প্রকৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাস ও আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থার কথা চিন্তা করে। বিশেষত আপাত সুস্থ জন্তুর ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বিচার করতে হবে মারণ-রোগ জলাতঙ্ক ও ভ্যাকসিন-সৃষ্ট জটিল পরিণতির কথা।

জলাতঙ্ক বিরোধী সিরাম (Antirabies Serum)—জলাতঙ্ক

প্রতিরোধে সিরামের ব্যবহার চিকিৎসা জগতের নবতর সংযোজন। ভ্যাকসিনের সঙ্গে যুক্তভাবে চিকিৎসা করলে সেটি হয়ে দাঁড়ায় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। যখন কোন ব্যক্তির জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ভ্যাকসিন ও সিরাম যুক্তভাবে চিকিৎসা করলে সে চিকিৎসার আর কোন বিকল্প নেই। সিরাম দিয়ে চিকিৎসা করলে খুব তাড়াতাড়ি সহিষ্ণু অনাক্রম্যতা (Passive immunity) গড়ে ওঠে এবং র‍্যাবিজ ভাইরাস আক্রান্ত স্থান থেকে খুব বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে না, আক্রান্ত স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই সিরামের এত কার্যকারিতা থাকলেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও কম নয়। শতকরা ১৫ থেকে ২৫ জনের অ্যানাফাইলেকটিক শক (Anaphylactic shock) ও সিরাম সিকনেস (serum sickness) হতে পারে। সেজন্যে কেবলমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর মারাত্মক কামড়ের ক্ষেত্রে সিরাম ব্যবহার করা হয়। সিরামের ডোজ কত লাগবে তা হিসাব করা হয় রোগীর শারীরিক ওজনের ওপর।

৪০ ইনটারন্যাশনাল ইউনিট (I. U.) প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য। এই হিসাবে খুব বেশি ৩০০০ ই. ই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে। রোগীকে সিরাম দেওয়া হবে কিনা বা কিভাবে দেওয়া হবে তা নির্ভর করছে রোগী কখন এল এবং দংশনকারী জন্তুটির অবস্থার ওপর। হাইপার ইমিউন সিরাম কসৌলিতে প্রস্তুত হয়।

রোগী যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসে পূর্ণ ডোজের কিছুটা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতে হবে। বাকিটা রোগীর গ্লুটিয়াল মাংসপেশীতে ইনজেকশান দিতে হবে। আর যদি ২৪ ঘণ্টার পর এবং ৭ দিনের মধ্যে আসে ক্ষতস্থানে দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই। সিরাম স্থানীয়ভাবে তখন কাজ করতে পারে না। ভাইরাস শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তাই স্থানীয় ক্ষততে দিয়ে লাভ হয় না। সম্পূর্ণ নির্ণীত ডোজই ইনজেকশান দ্বারা দিতে হয়। এছাড়া অ্যান্টির‍্যাবিজ ভ্যাকসিনও

ডোজ অনুযায়ী দিতে হবে, এবং চতুর্দশ ইনজেকশানের ৭ দিন ও তিন সপ্তাহ পরে মোট দুটি বুস্টার ডোজ দিতে হবে।

রোগী যদি ৭ দিন পরে আসে সিরাম চিকিৎসার আর প্রয়োজন নেই। তখন শুধুমাত্র ভ্যাকসিন চিকিৎসাই ভরসা। সিরাম ঘোড়া বা ভেড়া থেকে প্রস্তুত করা হয়। সিরামের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য রোগীকে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা নজরে রাখার প্রয়োজন। যেসব চিকিৎসাকেন্দ্রে এই ব্যবস্থা নেই সেখানে সিরাম চিকিৎসা হয় না, এমনকি কোলকাতার পাস্তুর ইনস্টিটিউটেও সিরাম চিকিৎসা করা হয় না।

হিউম্যান ইমিউন গ্লোবিউলিন-এ অ্যানাফাইলেকটিক বা সিরাম সিকনেসের মতো প্রতিক্রিয়া হয় না, তবে ইমিউন গ্লোবিউলিন আমাদের দেশে ব্যাপক পাওয়া যায় না। ভারত সিরাম প্রতিষ্ঠান ব্যাণিজ্যিকভাবে গামা গ্লোবিউলিন (Rabglob) সরবরাহ করেন। ১০ ই. ই. (I. U.) প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের হিসাবে ডোজ নির্ণীত করে ব্যবহার করা হয় সর্বোচ্চ ৫০০ ই. ই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাঁদের রিপোর্টে সুপারিশ করেছেন 'সমস্ত ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর কামড়ে (মারাত্মক কামড় এবং বিনা প্ররোচনায় বন্য জন্তুর কামড়ে) অ্যান্টির‍্যাবিজ সিরাম বা তার গ্লোবিউলিন অংশ ভ্যাকসিনের সঙ্গে যুগ্মভাবে দেওয়া উচিত। কামড়ের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। চিকিৎসার পর প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো সুদৃঢ় করার জন্য ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ দেওয়া প্রয়োজন।[১]

কসৌলির সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সুপারিশ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এবং তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলে সিরাম চিকিৎসার বিভিন্ন দিক চিন্তা করে তাঁরা দেখেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

SWHO, Technical Report Series 1966—321, 5th report.

এই সুপারিশ পুরোপুরি আমাদের দেশের ব্যাপক জনগণের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁরা এর কারণ হিসাবে বলেছেন—

দেখা গেছে কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে বা অল্প সময়ের ব্যবধানে সিরাম না দিলে (অন্তত ৭ দিনের মধ্যে) কোন ফল হয় না। আবার সিরামে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা ২০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে সিরাম-প্রতিক্রিয়া হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বছরে প্রায় তিনলক্ষ কুকুরে কামড়ানোর ঘটনা ঘটে। এদের সবাইকে সিরাম দেওয়ার মানেই হোল সিরাম-প্রতিক্রিয়া হওয়া রোগীর সংখ্যা বাড়ানো। বছরে প্রায় ষাট হাজার এই ধরনের সিরাম-প্রতিক্রিয়া জনিত রোগীর সৃষ্টি হবে। যদিও শুধুমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর কামড়ের ক্ষেত্রে সিরাম দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে, কিন্তু কামড়ের পর হারিয়ে যাওয়া বা লক্ষ্য না রাখতে পারা জন্তুর সংখ্যা বিপুল। তাতে সন্দেহ থেকেই যায় এবং সুপারিশ মতো সিরাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যদিও অনেকের ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

তাঁরা আরো বলেছেন—'ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে সাপে কামড়ানো, ডিপথেরিয়া, গ্যাস গ্যাংগ্রিন ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি এবং জীবন বাঁচানোর জন্য সেইসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অ্যান্টি স্নেকভেনাম (A.V.S.), অ্যান্টি ডিপথেরিক সিরাম (A.D.S.), অ্যান্টি টিটেনাস (A.T.S.) অ্যান্টি গ্যাস গ্যাংগ্রিন সিরাম (A.G.S.) ইত্যাদি বহুল ব্যবহার হয় সেখানে আবার একটি সিরামের বহুল ব্যবহার অভিপ্রেত তো নয়ই বরং বিপজ্জনক। তাঁরা বলেছেন এই সিরামের যথেচ্ছ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে সুফল না এনে বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই যদিও বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম এবং সেসব ক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় সিরাম ব্যবহার করা উচিত।

(২) সিরাম চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। আমাদের দেশের ব্যাপক জনগণের সেই খরচ বহন করার ক্ষমতা নেই।

(৩) সিরাম চিকিৎসা সক্রিয় অনাক্রম্যতা কিছুটা কমিয়ে দেয় যার জন্য অন্ততঃ একটি বুস্টার ডোজ নেওয়া প্রয়োজন—অথচ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে খুব কম সংখ্যক রোগীই বুস্টার ডোজ নেওয়ার জন্য সাড়া দেন।

(৪) সিরাম চিকিৎসার প্রতিক্রিয়ার জন্য কিছু কিছু বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই চিকিৎসককে দিয়েই চিকিৎসা করানো উচিত; কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে হাসপাতালে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক নেই, গ্রামের অনেক হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার দিয়েই চিকিৎসার কাজ চলে সেখানে এরকম ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসার দায়িত্ব নিশ্চয়ই কম্পাউণ্ডারের ওপর দেওয়া যায় না।

খরগোশ ইত্যাদি পরীক্ষাগারের পশুদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় (Incubation period) মানুষের থেকে অনেক আগে। মানুষের রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় ঐ জন্তুদের দ্বিগুণের কিছু বেশি সময়ে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিন দিনের মধ্যে সিরাম না দিলে ঐ জন্তুদের বাঁচানো সম্ভব হয় না। সেই হিসাবে মানুষের ক্ষেত্রে কামড়ের দিন থেকে সাত দিনের মধ্যে সিরাম দেওয়া উচিত।

প্রাথমিক চিকিৎসা

কুকুর বা কোন জন্তু যখন কামড়ায় তার লালা দিয়েই জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস কামড়-খাওয়া প্রাণীর শরীরে ঐ ক্ষতস্থান দিয়ে ঢোকে। সেজন্যে যতটা সম্ভব লালা পরিষ্কার করে দেওয়া যায় তত ভালো, এর পরেও যেটুকু ভাইরাস অবশিষ্ট থাকে তাকে দুর্বলতর ও অক্ষম করে দেওয়ার জন্য রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে (কার্বলিক অ্যাসিড ইত্যাদি) কটারাইজ করা দরকার বা দরকার হাইপার ইমিউন অ্যান্টির‍্যাবিজ সিরাম ব্যবহার করা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ক্ষতস্থান উপযুক্ত পরিষ্কার করার দ্বারাই ক্ষতিকারক ভাইরাস কমানো যায়, কমানো যায় জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনাও। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম সংখ্যক রোগীই এসব করেন। সেজন্য ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করার ওপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমরা একটু সচেষ্ট ও সচেতন হলেই পাগলা কুকুর বা বন্যজন্তু কামড়ালে অতি অল্প আয়াসেই রোগের প্রবলতা কমাতে পারি। সাবান ও জল নিশ্চয়ই সবার হাতের কাছে থাকে, তাই দিয়েই সম্ভব।

ক্ষতস্থানের প্রাথমিক চিকিৎসা

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা শুরু করা দরকার।

(১) ক্ষতস্থান সাবান জলে ধুয়ে ফেলুন যাতে ক্ষতিকারক লালা ধুয়ে যায়।

(২) এবার জলের ঝাপটা দিয়ে ঐ সাবানও ধুয়ে ফেলুন।

(৩) যদি হাতের কাছে সাবান না থাকে শুধু জলের ঝাপটা দিয়ে পরিষ্কার করে নিন ক্ষতস্থান।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলুন একেবারে এক মিনিটের মধ্যেই। যদি কোন ক্রমে দেরি হয়ে ঘণ্টা বা দিন গড়িয়ে যায় তবু

ভালো করে ধুয়ে ফেলতে ভুলবেন না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হলেও কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।

(৪) পরিষ্কার করার পর ক্ষতস্থান কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে কটারাইজ করতে হবে, তাতে ক্ষতস্থানের ভাইরাস আরো দুর্বল হবে। পরিবর্তে টিংচার আয়োডিন দিয়েও ঐ কাজ করা যেতে পারে। দেখতে হবে ক্ষতস্থান ছাড়া আর কোথাও যেন কার্বলিক অ্যাসিড না লাগে। মুখমণ্ডলে কখনো কার্বলিক অ্যাসিড লাগাবেন না। তাতে কুৎসিত দাগ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে টিংচার আয়োডিন ব্যবহার করা উচিত।

(৫) যদি পাওয়া যায় শরীরের যে কোন জায়গার ক্ষত. বিশেষত মুখমণ্ডলের ক্ষততে হাইপার ইমিউন অ্যান্টির‍্যাবিজ সিরাম লাগানো যেতে পারে। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাগানো যায় খুব ভালো ফল পাওয়া যায় এবং এর পরে বিশেষ লাভ হয় না।

(৬) গাঢ় কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে কটারাইজ করা হলে এক মিনিট পরে স্পিরিট দিয়ে কার্বলিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে হবে।

(৭) তৃতীয় শ্রেণীর কামড় হলে, যেমন—মাথা, ঘাড়, হাত, আঙুল ইত্যাদির স্থানীয় ক্ষততে অ্যান্টির‍্যাবিজ সিরাম ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি কামড়ের ২৭ ঘণ্টার মধ্যে রোগী হাসপাতালে উপস্থিত হয় তবে ঐ সিরামের কিছু অংশ স্থানীয় ভাবে লাগাতে হবে। বাকি অংশ মাংসপেশীর মধ্যে ইনজেকশান দিতে হবে। ভ্যাকসিন যেখানে দেওয়া হবে তার থেকে আলাদা জায়গায় Serum injection দেওয়া হয়।

(৮) ক্ষত বেশি হলে সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করা আদৌ উচিত নয় বরং ক্ষতিকর। তাতে ভাইরাস সেলাই-এর সুঁচের সাহায্যে দেহের গভীরে চলে যেতে পারে। যদি সেলাই করার প্রয়োজন হয় দু' থেকে তিনদিন পরে সেলাই করা উচিত।

(৯) যে-কোন ক্ষত সৃষ্টি হলে যেমন ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক নিতে হয় ; এক্ষেত্রে কামড় বা আঁচড় থেকে ক্ষত সৃষ্টি হয়, সম্ভাবনা থেকে যায় ধনুষ্টংকারের। তাই রোগীর যদি আগে থেকে ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক নেওয়া থাকে শুধু মাত্র টিটেনাস টক্সয়েড-এর বুস্টার ডোজ দিলেই চলবে। অন্যথায় এ. টি. এস (Antitetanus serum) এবং টিটেনাস টক্সয়েড দিতে হবে।

(১০) ঘা শুকোবার জন্য এবং জীবাণু আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ মতো অ্যান্টিবায়োটিক শ্রেণীর ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

এবার কাজ হবে কুকুরটিকে লক্ষ্য রাখা। কুকুর কামড়ালে সব থেকে বড় সমস্যা কুকুরটি পাগল কিনা বা তার থেকে কতটা পরিমাণ বিপদ আসতে পারে তা জানা। সেজন্য কুকুরটিকে লক্ষ্য রাখা একটি বিশেষ প্রধান কাজ। আগেই বলা হয়েছে কুকুরটি দশদিন বেঁচে গেলে নিশ্চিন্ত ও বিপদমুক্ত হওয়া যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রয়োজন ক্ষেত্রে জলাতঙ্ক বিরোধী ভ্যাকসিন (Antirabies vaccine—ARV) নেওয়া দরকার।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন নিতে হবে

(১) জন্তুটির মধ্যে যদি পাগলামির লক্ষণ দেখা যায় (আগে বর্ণনা আছে)।

(২) জন্তুটি যদি কামড়ের দশদিনের মধ্যে মারা যায় বা মেরে ফেলা হয়।

(৩) যদি বেপরোয়া ভাবে কামড়াতে থাকে।

(৪) বিনা প্ররোচনায় কামড় হলে।

(৫) যদি রাস্তার কুকুর হয় বা যে জন্তুকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়।

(৬) বন্য জন্তু কামড়ায়।

(৭) যখন কোন কাটা জায়গায় চেটে দেয় বা কোনক্রমে লালা লেগে যায়।

(৮) পরীক্ষাগারে জন্তুটির মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে রোগের চিহ্ন ধরা পড়ে।

জন্তুটি আপাতসুস্থ থাকলেও সেই রকম সন্দেহজনক কুকুরের বা জন্তুর কামড় হলে ভ্যাকসিন নেওয়া প্রয়োজন, তবে কুকুর দশদিন বেঁচে থাকলে চিকিৎসা বন্ধ করা দরকার।

কখন ভ্যাকসিন নিতে হবে না[১]

(১) পরনের কাপড়ের ওপরে কামড় দিয়ে কাপড় ছিঁড়ে বা ফুটো করে যদি চামড়ায় কোন ক্ষত সৃষ্টি না করে।

(২) কোন পাগলা জন্তু যখন অন্য কোন পশুকে কামড়ায়—সেই কামড় খাওয়া পশুকে যিনি সেবা করবেন তাঁর ইনজেকশান নেওয়া প্রয়োজন নেই।

(তবে সেই পশু যদি জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন)।

(৩) জলাতঙ্কে আক্রান্ত পশুর (গরু, ছাগল) দুধ ফুটিয়ে খেলে কোন ভয় থাকে না। না ফুটিয়ে খাওয়া হয়ে থাকলে প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া ভালো।

(৪) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামড়ের ক্ষেত্রে যদি জন্তুটি দশদিন বেঁচে থাকে ও সুস্থ থাকে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।[২]

---

১ স্বাস্থ্য দপ্তর পঃ বঃ প্রকাশিত নির্দেশাবলী ৪ (২০০)-১৯৮০

২ অবশ্য এমনও দেখা গেছে 'রোগী জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত (কোন কোন ক্ষেত্রে ছ-মাস) দংশনকারী পোষা কুকুর বেঁচে আছে', এন. ভীরা রাঘবন ১৯৬৬, ১৯৭০ সালে দুটি রিপোর্টে কুন্নুর পাস্তুর ইনস্টিটিউটের এরকম দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। "২৩০টি আপাত সুস্থ ও সন্দেহজনক কুকুরের লালা পরীক্ষা করে দেখেছেন ১৩টি ক্ষেত্রে লালায় ভাইরাস পাওয়া গেছে।" এসব ক্ষেত্রে জন্তুগুলি নিজেরা রোগাক্রান্ত না হয়েও রোগের বাহক।

একটি ছেলের পরনের প্যান্টের উপর কুকুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছিল—চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় ভ্যাকসিন ইনজেকশান দেওয়া হোল ছেলেটিকে। ব্যস্ততার মধ্যে ছেঁড়া প্যান্ট সেলাই করতে বসলেন মা। কখন অসতর্ক মুহূর্তে সুঁচ তাঁর হাতের আঙ্গুলে ফুটে গেছে খেয়াল করেন নি তিনি। এই ছোট ব্যাপারটিকে আগে গুরুত্ব দেননি—হামেশাইতো এরকম হয় সাংসারিক কাজে। কিছু দিন পরে জলাতঙ্কের লক্ষণ দেখা গেল তাঁর মধ্যে—তখন আর কিছুই করার নেই। স্রেফ অবহেলার জন্য বা না জানার জন্য এই প্রাণনাশী রোগের শিকার হয়ে মারা গেলেন মা। এক্ষেত্রে প্যান্টে লেগে থাকা কুকুরটির লালা সুঁচ ফুটে ক্ষত হওয়া তাঁর আঙ্গুলে লাগার ফলেই রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

কুকুর কামড়ালে চিকিৎসা নির্ভর করে কি ধরনের কামড় হয়েছে তার ওপর। কামড়ের ধরন ভেদে চিকিৎসা ভিন্নতর হয়।

কামড়ের শ্রেণী বিভাগ—১, ২, ৩।

প্রথমশ্রেণী—

(১) সমস্ত ধরনের চেটে দেওয়া(কিন্তু সদ্য কাটা বা রক্তপাত হওয়া আঁচড়ানোর উপর চাটা হলে দ্বিতীয় শ্রেণী হবে)

(২) যদি কেউ জলাতঙ্কে আক্রান্ত পশুর (গরু ইত্যাদি) গরম না করা দুধ খেয়ে থাকেন বা জলাতঙ্কে আক্রান্ত জন্তুর লালার সংস্পর্শে এসে থাকেন বা কাঁচামাংস নিয়ে নাড়াচড়া করে থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

(১) সমস্ত ধরনের কামড়—কামড়ের সংখ্যা পাঁচের কম হবে এবং মাথা, ঘাড়, হাত, মুখ, হাতের আঙ্গুল ছাড়া শরীরের অন্যান্য জায়গায় হবে।

(২) সদ্যকাটা ঘায়ে বা রক্তপাত হওয়া আঁচড়ে, যদি চাটার ঘটনা থাকে।

(যদি এই শ্রেণীভুক্ত কোন রোগী চৌদ্দদিন বা তার পরে চিকিৎসা নিতে আসেন তাঁদের তৃতীয় শ্রেণীর রোগীদের মতো চিকিৎসা করা প্রয়োজন—

তৃতীয় শ্রেণী—

(১) শরীরের যে কোন জায়গায় পাঁচ বা পাঁচের অধিক কামড়ের ক্ষতসৃষ্টি হলে।

(২) মাথা, ঘাড়, হাত, মুখ ও হাতের আঙ্গুলে সমস্ত ধরনের কামড় বা আঁচড়—সংখ্যায় যে কটাই হোক না কেন।

(৩) নেকড়ে, শেয়াল ইত্যাদি যে কোন বন্যজন্তু শরীরে যে কোন জায়গায় কামড়ায়।

সূত্র : ১ Preventive and Social medicine—Park Park
২ Pasteur Institute, Calcutta, June '83
৩ P.S.M.—Park and Park

ভ্যাকসিনের ডোজ

ভ্যাকসিনের ডোজের কথা বলতে গেলে আবার এসে যায় পাস্তুরের কথা। পাস্তুর রোগের দাওয়াই বাতলালেন—এবার প্রয়োজন হোল তার মাত্রা ঠিক করার। সঠিক মাত্রার জন্য যখন পাস্তুর খুব বিচলিত সেই সময় সুযোগও ঘটে গেল। সেদিন ছিল ৬ই জুলাই ১৮৮৫। ন'বছরের একটি ছেলে যোশেফ মিস্টারকে আনা হোল পাস্তুরের কাছে। ছেলেটিকে পাগলা কুকুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে। বাঁচার আর নেই কোন আশা। তাই একমাত্র পাস্তুরই ভরসা—যদি দেখাতে পারেন আশার আলো। পাস্তুর দারুণ সাহসের সঙ্গে তাঁর প্রথম চিকিৎসা শুরু করলেন। নানারকম মাত্রায় প্রতিষেধক দিতে থাকলেন। ছেলেটিকে প্রথম দিন দেওয়া হোল সেই খরগোশের স্পাইনাল কর্ড থেকে যেটা চৌদ্দদিন ধরে শুকোনো হয়েছে—দ্বিতীয় দিন যা তের দিন শুকোনো হয়েছে। এই ভাবে চলতে থাকলো—শেষ দিন দেওয়া হোল সেই খরগোশ থেকে যা আগের দিন র‍্যাবিজে মারা গেছে। ক'দিনে ছেলেটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠল। তিন সপ্তাহ পরে তাকে বিপদমুক্ত ঘোষণা করা হোল।

ঐ সময় থেকে একশ বছর পেরিয়ে এসেছি আমরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই রোগের চিকিৎসায় উন্নততর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যবহৃত ভ্যাকসিনের ডোজ নির্ভর করবে আক্রান্ত রোগীর ওজন ও কি ধরনের কামড় হয়েছে তার ওপর—

শ্রেণী	ওজন		
	৩০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত	৩০ থেকে ৩৬ কিলোগ্রাম পর্যন্ত	৩৬ কিঃ গ্রামের বেশি
প্রথম শ্রেণী—	২সিসি × ৭ দিন	২সিসি × ৭ দিন	২সিসি × ৭ দিন
দ্বিতীয় শ্রেণী—	২সিসি × ১৪ দিন	৫সিসি × ১৪দিন	৫সিসি × ১৪দিন
তৃতীয় শ্রেণী—	২সিসি × ১৪ দিন	৫সিসি × ১৪দিন	১০সিসি × ১৪দিন

[জুন '৮৩ কোলকাতার পাস্তুর ইনস্টিটিউটের নির্দেশ অনুযায়ী]

বুস্টার ডোজ—ইনডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কামড়ের ক্ষেত্রে বুস্টার ডোজ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন।[১]

দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে একটি বুস্টার ডোজ একই পরিমাণের চতুর্দশ ইনজেকশানের তিন সপ্তাহ পরে এবং তৃতীয় শ্রেণীর কামড়ে চতুর্দশ ইনজেকশানের ৭ দিন পরে এবং তিন সপ্তাহ পরে—এইভাবে দুটি বুস্টার ইনজেকশান দিতে হবে। বুস্টার ডোজ দেওয়ার আগে রোগীকে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার সে বুস্টার ডোজ নেওয়ার উপযুক্ত কিনা, স্নায়ুতন্ত্র পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার তার স্নায়ু-পক্ষাঘাতের কোন আশঙ্কা আছে কিনা ইত্যাদি।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭৩ সালে সুপারিশ করেছেন যখন সিরাম ও ভ্যাকসিন যৌথভাবে চিকিৎসা করা হবে, যেহেতু সিরাম ভ্যাকসিনের সক্রিয় অনাক্রম্যতা গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিনের বুস্টার ইনজেকশান দেওয়া প্রয়োজন।[২]

কসৌলির সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এই সুপারিশের ব্যাপারে তাঁদের মতামত রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন—যাঁরা শুধুমাত্র ভ্যাকসিনের দ্বারা চিকিৎসিত হচ্ছেন তাঁদের ক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বুস্টার ডোজ দেওয়ার ব্যাপারে যে সুপারিশ করেছেন তা হয়তো সেইসব দেশে প্রযোজ্য যেখানে আমাদের দেশের তুলনায় কম ডোজে ভ্যাকসিন দেওয়ার রীতি চালু আছে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তাতে অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়া(antibody response) এক বছর থাকে—যদিও ব্যক্তি বিশেষে এর তারতম্য ঘটতে পারে। মারাত্মক কামড়ের ক্ষেত্রে (তৃতীয় শ্রেণী) যেখানে ভ্যাকসিনের সঙ্গে সিরাম ব্যবহার হয় চতুর্দশ ইনজেকশানের পর সেক্ষেত্রে দুটি

---

১ Special Report Series, 58, ICMR (1957) New Delhi.

২ WHO Technical Report Series No. 523, 1973.

বুস্টার ইনজেকশান দেওয়া হয়। তাতে দ্বিতীয় বুস্টারের বেলায় কিছু প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

স্নায়ু পক্ষাঘাতের মতো প্রতিক্রিয়া ইনজেকশানের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বেড়ে যেতে পারে—এই ধরনের চিন্তা অনেকের মনে আসতে পারে, বিশেষত যেখানে শিক্ষিত শ্রেণীর রোগীরাই বুস্টার ডোজে সাড়া দেন বেশি। তাঁদের এ সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল করার সাথে সাথে প্রয়োজন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা বিশেষত স্নায়ুজনিত কোন প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। জলাতঙ্ক হওয়া এবং অপর পক্ষে স্নায়ু পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা মাথায় রেখে বুস্টার ডোজ দেওয়া উচিত।

যেখানে কুকুরটি পাগলা নিশ্চিত বা কুকুরকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়—

(১) যদি রোগী কামড়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উপস্থিত হয়—স্থানীয় ক্ষততে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। সিরাম প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা করে এক টুকরো জীবাণুমুক্ত গজ হাইপার ইমিউন সিরামে ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে এবং ড্রেসিং করে দিতে হবে। ত্বকের মধ্যে পরীক্ষা করে স্থির নিশ্চিত হতে হবে রোগীর সিরামে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। এবার ডোজ অনুযায়ী হাইপার ইমিউন সিরামের বাকি অংশ পাছার মাংসপেশী (gluteal muscle)-তে ইনজেকশান দিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে ডোজ অনুযায়ী ভ্যাকসিন চিকিৎসাও শুরু করতে হবে। ভ্যাকসিন ইনজেকশানের পরে বুস্টার ডোজ নিতে হবে।

(২) যদি ২৪ ঘণ্টার পর এবং ৭ দিনের মধ্যে আসে নিয়মানুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে, কেবলমাত্র ক্ষতস্থানে হাইপার ইমিউন সিরাম লাগানোর প্রয়োজন নেই। পুরো ডোজ সিরাম ইনজেকশান পদ্ধতিতে দিতে হবে। ডোজ অনুযায়ী ভ্যাকসিন চিকিৎসা ও দুটি বুস্টার ইনজেকশান নিতে হবে।

(৩) যদি ৭ দিনের পরে আসে তাহলে হাইপার ইমিউন সিরামের

আর কোন ফল পাওয়া যায় না। তাই প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডোজ অনুযায়ী শুধু ভ্যাকসিন নিতে হবে। এক্ষেত্রে বুষ্টার ডোজের কোন প্রয়োজন নেই।

যেখানে কুকুরকে দশদিন লক্ষ্য রাখা সম্ভব—(১) যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী আসে, ক্ষতস্থানে স্থানীয় চিকিৎসার সঙ্গে যদি সিরাম পাওয়া যায় তা স্থানীয় ক্ষততে লাগাতে হবে, এবং ডোজের বাকিটা ইনজেকশান দিতে হবে। এরপর ডোজ অনুযায়ী ৫ দিন ভ্যাকসিন দিতে হবে। ৬ দিন পর্যন্ত কুকুর বেঁচে থাকলে আর ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু কুকুরের কামড়ের দিন থেকে দশ দিন লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) যদি চব্বিশ ঘণ্টা থেকে সাতদিনের মধ্যে রোগী আসে স্থানীয় চিকিৎসা, হাইপার ইমিউনের পুরো ডোজ ইনজেকশান এবং ডোজ অনুযায়ী ভ্যাকসিন শুরু করে দিতে হবে। ভ্যাকসিন দিতে হবে পাঁচদিনের জন্য বা তার কম (দশদিন হতে যে কদিন বাকি থাকবে)। ইনজেকশান পাঁচটার বেশি হবে না। বাকি দিনগুলি কুকুরকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৩) যদি রোগী সাত দিন পরে আসে তার ডোজ অনুযায়ী কেবল মাত্র ভ্যাকসিন দিতে হবে যে ক'দিন লক্ষ্য রাখা বাকি থাকবে।

যদি দশদিন পর্যন্ত কুকুর সুস্থ থাকে ও বেঁচে থাকে আর ইনজেকশান নেওয়ার প্রয়োজন নেই। অপরপক্ষে কুকুরটির যদি পাগলা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, মরে যায় বা হারিয়ে যায় তবে শুরু থেকে হিসাব করে মোট ১৪টি ইনজেকশান নিতে হবে।

প্রতিরোধ ক্ষমতা কতদিন থাকে—

যদিও র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন নেওয়ার পর অর্জিত সম্পূর্ণ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠতে সময় লাগে তবু আংশিক ক্ষমতা ইনজেকশান নেওয়ার থেকে শুরু করে ৩ সপ্তাহের মধ্যে গড়ে ওঠে, এবং প্রায়

একমাসের মধ্যেই সেই ক্ষমতা সম্পূর্ণ জন্মে যায়। ইনজেকশান নেওয়ার শেষ দিন থেকে ছয়মাস পর্যন্ত এই ক্ষমতা বজায় থাকে। র‍্যাবিজ ভাইরাস মস্তিষ্ক কলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্তই এই ভ্যাকসিন ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে ভাইরাসকে অক্ষম করে তোলে। ভাইরাস মস্তিষ্ক কলায় আবদ্ধ হলে আর কিছু করার থাকে না।

পুনরাক্রমণ—যাঁর একবার চিকিৎসা করা হয়েছে দুর্ঘটনাক্রমে আবার যদি তিনি আক্রান্ত হন তাঁর চিকিৎসার ধারা কি হবে এই নিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন আক্রান্ত ব্যক্তি। এই ধরনের ক্ষেত্রে চিকিৎসার ধারাকে দুভাবে ভাগ করা হয়—(১) চিকিৎসার ছ' মাসের মধ্যে এবং (২) চিকিৎসার ছ'মাস পরে।

চিকিৎসার ছ'মাসের মধ্যে—

(ক) প্রথমশ্রেণীর আক্রান্তের চিকিৎসার ৬ মাসের মধ্যে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর আক্রমণ হয় তবে নতুন আক্রমণ যে শ্রেণীর মধ্যে পড়বে সেই শ্রেণীর পূর্ণ চিকিৎসা করতে হবে।

(খ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর আক্রমণের ৬ মাসের মধ্যে পুনরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর আক্রমণ হলে তবে মাত্র দুটি বুস্টার ইনজেকশান নিতে হয় (প্রতিটি ৫ সি সি করে)।

প্রথমটি পুনরাক্রমণের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

দ্বিতীয়টি---প্রথম বুস্টারের সাতদিন পর।

(গ) যেকোন শ্রেণীর আক্রমণের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) ৬ মাসের মধ্যে পুনরায় প্রথম শ্রেণীর আক্রমণ হলে মাত্র একটি বুস্টার ইনজেকশান নিলেই চলবে। বুস্টার ইনজেকশানটি হবে ২ সি সি।

ছ'মাস পরে—

প্রথম আক্রমণের ছ'মাস পরে যে-কোন শ্রেণীর আক্রমণই হোক না কেন নতুন আক্রমণ যে শ্রেণীভুক্ত হবে সেই শ্রেণীর পূর্ণ চিকিৎসা করা দরকার।

হিপোক্রিটিস এর তত্ত্ব চিকিৎসা বিদ্যাকে ম্যাজিক; অন্ধবিশ্বাসের ধারণা থেকে তুলে এনেছে বিজ্ঞানের পর্যায়ে—
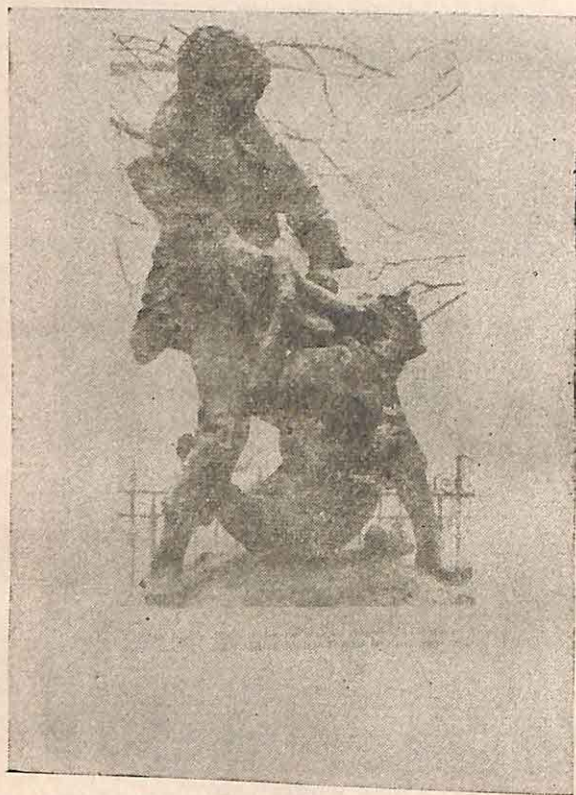
প্যারীসের পাস্তুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণের
বিখ্যাত মর্মরমূর্তি

ভ্যাকসিনের সংরক্ষণ (Storage)

ভ্যাকসিন ঠিক মতো রাখা না হলে র‍্যাবিজ অ্যান্টিজেন যে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলে তা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়া স্নায়ু পক্ষাঘাতে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না, ফলে উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে স্নায়ু পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে কিন্তু রোগ বিরোধী ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। যদি রেফ্রিজারেটারে রাখা যায় খুব ভালো হয়। + ৪° সেন্টিগ্রেড থেকে + ১০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটারে রাখা সব থেকে ভালো। রেফ্রিজারেটারের অভাবে সাধারণ বরফ বাক্সেও রাখা যেতে পারে।

ইনজেকশান কিভাবে ও কোথায় দেওয়া হয়—

৫ থেকে ১০ মিলিলিটারের হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ এই কাজে প্রয়োজন। এই সিরিঞ্জকে গরমজলে ফুটিয়ে বীজাণুমুক্ত করা দরকার। কখনই অ্যালকোহল বা স্পিরিট বীজাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

পেটে নাভির চারদিকে ইনজেকশান দেওয়া সব থেকে আদর্শ জায়গা। এখানে বিস্তৃত জায়গা পাওয়া যায়। চামড়ার নীচে (Subcutaneous) ইনজেকশান দেওয়া হয়। প্রসূতির ক্ষেত্রে পেটে ইনজেকশান দেওয়া উচিত নয়। সেক্ষেত্রে স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী স্থানে বা উরু (thigh)-তে দিতে হয়। এই ইনজেকশান দেওয়ার সঙ্গে খাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। অনেক চিকিৎসা কেন্দ্রে খালিপেটে ইনজেকশান দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং খালিপেটে নিলে রোগীর মাথা ঘুরে অজ্ঞান (Vasovagal attack) হওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়।

যেখানে ভ্যাকসিন প্রস্তুত হয়—

জলাতঙ্ক বিরোধী ভ্যাকসিন প্রস্তুতির জন্য ভারতবর্ষে অনেক কেন্দ্র রয়েছে। এই সব কেন্দ্রে ভ্যাকসিন প্রস্তুতি ছাড়াও আধুনিক

চিকিৎসার আরো সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য গবেষণা ও ঐ রোগ থেকে বাঁচানোর জন্য চলে চিকিৎসা। কেন্দ্রগুলির ওপর দায়িত্ব ভাগ করা আছে তাঁরা কোন্ কোন্ জায়গায় সরবরাহ করবেন।

কেন্দ্রের নাম	যেখানে সরবরাহ করেন
(১) হফকিন ইনস্টিটিউট বোম্বে	বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ ও গোয়া
(২) সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট কসৌলি	হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান চণ্ডীগড়
(৩) পাস্তুর ইনস্টিটিউট কোলকাতা	পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম
(৪) পাস্তুর ইনস্টিটিউট অব ইনডিয়া, কুন্নুর	তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী
(৫) পাস্তুর ইনস্টিটিউট শিলং	উত্তরাঞ্চল ও ভুটান
(৬) পাবলিক হেল্থ ইনস্টিটিউট কেরালা	কেরালা
(৭) পাস্তুর ইনস্টিটিউট বিহার	বিহার
(৮) স্টেট ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট পটুয়াডাঙ্গা। নৈনিতাল	উত্তর প্রদেশ
(৯) ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট কর্ণাটক	কর্ণাটক, গোয়া
(১০) ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট বরোদা	গুজরাট
(১১) কিং ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ মেডিসিন, মাদ্রাজ	মাদ্রাজ, তামিলনাড়ু
(১২) ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ মেডিসিন, হায়দ্রাবাদ	অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ

চাহিদা বিপুল ভ্যাকসিন অপ্রতুল

কোলকাতার পাস্তুর ইনস্টিটিউট সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালের মাধ্যমে ও তাঁদের আউটডোরের মাধ্যমে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিষেধক দিয়ে থাকেন। সারা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন হাসপাতাল তাঁদের প্রতিনিধি মারফৎ বা ডাক মারফৎ সংগ্রহ করেন ভ্যাকসিন। এছাড়াও পশ্চিমবাংলায় অবস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংগঠন ও রেলওয়ে বিভাগকেও এই প্রতিষেধক সরবরাহ করেন। এর পরেও আবার প্রয়োজনে বিহার ও উড়িষ্যার জন্য সরববাহ করা হয়।

শুধু পাস্তুর ইনস্টিটিউট, কোলকাতার বহির্বিভাগের রোগীর তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে কত বিপুল চাহিদা এই ভ্যাকসিনের। এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র কোলকাতা শহরের, হয়তো শহরতলীর কিছু অংশ। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালের পরিসংখ্যান এর মধ্যে নেই।

সাল	মোট রোগী
৭৮-৭৯	১১৫৩২
৭৯-৮০	১০২৮৯
৮০-৮১	১৩৬৮৮
৮১-৮২	১৩৮০০
৮২-৮৩	১৮৬০০
৮৩-৮৪	২০০০০
৮৪-৮৫	২৫৬০০

এই বিপুল সংখ্যক রোগীকে প্রতিষেধকের আওতায় আনার জন্য পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ভ্যাকসিন প্রস্তুত হয়। নীচের তালিকায় দেখা যাবে কি বিপুল পরিমাণ ভ্যাকসিন তৈরী করেন তাঁরা—

সাল	প্রস্তুত ভ্যাকসিনের পরিমাণ (মিলি লিটারে)
১৯৭৫	৩০ লক্ষ ৫৭ হাজার
১৯৭৬	৩০ লক্ষ ৭৬ হাজার
১৯৭৭	৩৩ লক্ষ ৯৪ হাজার
১৯৭৮	৩২ লক্ষ ৮০ হাজার
১৯৭৯	৩৩ লক্ষ ৪৯ হাজার
১৯৮০	৩২ লক্ষ ৪১ হাজার
১৯৮১	৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার
১৯৮২	৩২ লক্ষ ৮২ হাজার
১৯৮৩	৩২ লক্ষ ৪৭ হাজার
১৯৮৪	৩২ লক্ষ ৯২ হাজার

দেখা যাচ্ছে আউটডোরে রোগীর সংখ্যা ১৯৭৮ সালের তুলনায় ১৯৮৪ সালে দ্বিগুণের অনেক বেশী এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানেও সমহারে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ধরা যেতে পারে। অথচ ১৯৭৮ সালের তুলনায় ১৯৮৪ সালে ভ্যাকসিন প্রস্তুতির পরিমাণ বাড়েনি। তাই ভ্যাকসিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছেন না কর্তৃপক্ষ। ফিরে যেতে হচ্ছে আতঙ্কগ্রস্ত রোগীকে। যথাসময়ে মফঃস্বল বা গ্রামের হাসপাতালে ভ্যাকসিন পৌঁছায় না। বেড়ে যাচ্ছে জলাতঙ্ক রোগীর সংখ্যাও।

পাস্তুর ইনস্টিটিউটের আউটডোরে যেমন হাজার হাজার রোগীকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, তেমনি মফঃস্বল শহর থেকে স্থানীয় চিকিৎসকের সুপারিশ নিয়ে শ'য়ে শ'য়ে রোগী আসেন ভ্যাকসিনের জন্য। একটি পূর্ণ ডোজ অর্থাৎ ১৪×১০=১৪০ সি. সি. ভ্যাকসিনের

প্রস্তুতিতে খরচ পড়ে প্রায় ৬০ টাকা। অথচ সরকারী আনুকূল্যে রোগীদের মাত্র দশ টাকায় তা সরবরাহ করা হয়।

যাঁরা ইনজেকশান নিচ্ছেন তাঁদের জন্য—

(১) মদ বা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় স্নায়ু পক্ষাঘাত হতে সাহায্য করে। কখনও কখনও ওষুধের প্রতিক্রিয়া মদ্যপান জনিত বিক্রিয়ায় প্রভাবিত হতে পারে। তাই চিকিৎসা চলাকালীন এবং চিকিৎসার পরও একমাস মদ্যপান নিষেধ।

(২) অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করবেন না।

(৩) রাত জাগবেন না।

(৪) খাদ্যের কোন বাধা নেই তবে অতিরিক্ত মশলাযুক্ত উত্তেজক খাদ্য ও ঠাণ্ডা পানীয় এড়িয়ে চলা ভালো।

(৫) চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ খাবেন না; বিশেষতঃ স্টেরোয়েড।

ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়া

বিভিন্ন ওষুধের যেমন কিছু প্রতিক্রিয়া আছে জলাতঙ্কের প্রতিষেধকেও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তবে খুব কম রোগীরই প্রতিক্রিয়া হয়। অধিকাংশ রোগীই চিকিৎসা চলাকালীন বা সম্পূর্ণ হওয়ার পর কোন অসুবিধা অনুভব করেন না। খুব কম সংখ্যক রোগীর মধ্যে নীচের মতো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়—

(১) সাধারণভাবে—মাথার যন্ত্রণা, অনিদ্রা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা ও পাতলা পায়খানা।

(২) স্থানীয় ভাবে—ইনজেকশানের জায়গা চুলকাতে পারে, ব্যথা হতে পারে। মাংসপেশীর ব্যথা হতে পারে, ঐ স্থানটি ফুলে লাল হয়ে যেতে পারে। এইসব উপসর্গ সাধারণত স্থূলকায় রোগীর ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। যাঁদের প্রতিক্রিয়া হয় ৫।৬টি ইনজেকশান নেওয়ার পর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার আগে সাধারণত হয় না। গরম সেঁক

দেওয়া, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি, অ্যালার্জি বিরোধী ওষুধ, প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার ক'রে এই উপসর্গ কমানো যেতে পারে। অনেক সময় ইনজেকশান নেওয়ার জায়গায় অ্যাবসেস (abcess) হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে ; তা ঘটে যদি ইনজেকসান দেওয়ার সময় জীবাণু-মুক্ত পদ্ধতি সঠিক ভাবে গ্রহণ না করা হয়।

(৩) অ্যালার্জি জনিত—আমবাত (urticaria)

(৪) সব থেকে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হোল অন্তর্মুখী স্নায়ু পক্ষাঘাত (Neuroparalysis)। ফলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়—চিকিৎসা চলাকালীন বা চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সময় ও স্থান বিশেষে এই রোগের প্রবলতার তারতম্য ঘটে। তবে এই প্রতিক্রিয়া এত কম সংখ্যায় হয় যে প্রায়ই দেখা যায় না। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রচলিত প্রতিষেধক যা স্নায়বিক কলা থেকে তৈরী হয় (ARV) তার থেকে প্রতিলাখে মাত্র ১ থেকে ৩ জনের এই পরিণতি হতে পারে। অপরপক্ষে Duck Embryo ভ্যাকসিনে প্রতি ৩ লাখে ১ জনের হতে পারে। তবে Duck Embryo ভ্যাকসিনের অন্যান্য অসুবিধার জন্য এর ব্যবহার সীমিত। এই প্রতিক্রিয়া চিকিৎসা শুরুর পঞ্চম দিন থেকে আসতে পারে। প্রথমে মাথার যন্ত্রণা, গা-হাত ব্যথা, ঘাড় এবং হাত-পায়ের আড়ষ্টতা ইত্যাদি আসতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া হলে চিকিৎসা শুরুর এক মাসের মধ্যেই হয়, তারপরে আর দেখা যায় না। শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে ২০ দিনের মধ্যে দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়ার পরিণতি স্থায়ী পক্ষাঘাত, অনেক সময় মৃত্যুও হতে পারে। আগেই বলেছি এর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। অনেকের মধ্যে দেখা গেছে এই প্রতিষেধক সম্বন্ধেও যথেষ্ট আতঙ্কভাব। যদিও একেবারে অমূলক নয়, তবু জলাতঙ্কের ভয়াবহতার তুলনায় এটি কিছুই নয়। তাই প্রয়োজন ক্ষেত্রে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক অহেতুক দেরী না করে চিকিৎসকের

পরামর্শ অনুযায়ী নেওয়া উচিত। দেরী করার অর্থ হল হয়তো বা জলাতঙ্কের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া।

রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাময়িক ভাবে চিকিৎসা স্থগিত রাখতে হয়। রোগের উপসর্গ থাকছে কি কমছে খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে। উপসর্গ কমলে 'স্নায়ু পক্ষাঘাতের লক্ষণ নয়' এই ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে। চিকিৎসার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামড়ে ২১ দিন পর এবং তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে ৭ দিন এবং ২১ দিন পরে বুষ্টার ডোজ দিতে হয়।

চিকিৎসা বন্ধ করার ব্যাপারে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে নিশ্চিত জানা পাগলা কুকুরের কামড়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বন্ধ থাকবে কিনা। যদি স্নায়ু অসাড়তার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে চিকিৎসা বন্ধ রাখতেই হবে এবং রোগ লক্ষণ কমে গেলে chick embryo ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হবে।

ভ্যাকসিন—নবতর সংযোজন

সেল কালচার ভ্যাকসিন (cell calture vaccine)—স্নায়বিক কলা ভ্যাকসিন ও এমব্রিও ভ্যাকসিনে নানারকম ক্ষতিকারক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয়। বিশেষতঃ এদের মধ্যে কলা (tissue) থাকার জন্যই অ্যালার্জি ও প্যারালিসিস্ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সেল কালচার পদ্ধতিতে পোলিও রোগের প্রতিষেধক থেকে শিক্ষা নিয়ে আরো নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন ভ্যাকসিন প্রস্তুত করার কথা ভাবছিলেন বিজ্ঞানীরা। আমেরিকার উইস্টার ইনস্টিটিউটের গবেষকরা দীর্ঘ গবেষণার পর মানুষের ডিপ্লয়েড কোষ-এ এক বিশেষ অক্ষম ভাইরাস দেখালেন নাম দিলেন WI-38। এই WI-38 কোষগুলির উৎপত্তি সাধারণ ফ্রাইব্রোব্লাস্ট কোষ এবং এমব্রিওনিক ফুসফুসের কলা থেকে। কোষের স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের (৪৬) সংখ্যা থেকেই ডিপ্লয়েড কথার উদ্ভব। এই কোষগুলিকে বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং ভ্যাকসিন প্রস্তুতিতে এর যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমানে হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল স্ট্রেন ভ্যাকসিন (HCDS) ফ্রান্স ও আমেরিকায় বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। ল্যানসেট পত্রিকা ১৯৭৬ সালে রিপোর্ট দিয়েছেন এর মাত্র একটি ডোজই উপযুক্ত অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে সক্ষম এবং এর প্রতিক্রিয়া হয় না বললেই চলে। HCDS ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যাপারে আগুপিছু চিন্তার কোন কারণ নেই। যেহেতু এই ভ্যাকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, যেকোন ব্যক্তির সামান্যতম আশঙ্কা থাকলেই এই ভ্যাকসিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবহার করা যেতে পারে। তাৎক্ষণিক স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় আদৌ কোন আশঙ্কা ছিল কিনা।

এই ভ্যাকসিনের প্রস্তুতকারক সংস্থা ফ্রান্সের মেরিক্স ইনষ্টিটিউট,

তাঁদের ভ্যাকসিন সম্বন্ধে বলেছেন—এই ভ্যাকসিন হোল MERIEX inactivated rabies vaccine for prophylaxis before and after exposure treatment (strain wistar PM 138, 1503-3M prepared on human deploid cell inactivated by β-propiolactone)। তাঁরা কুকুর কামড়ানোর আগে (pre-exposure) চিকিৎসক, প্রাণীবিদ, যাঁরা জন্তু নিয়ে কাজ করেন এবং সংস্পর্শে আসেন, হাসপাতালের এবং পরীক্ষাগারের কর্মী, যাঁরা জলাতঙ্ক রোগীর সেবা করেন বা চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত, যাঁদের র‍্যাবিজ ভাইরাস নিয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের এই ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি পরপর র‍্যাবিজ-এর ঘটনা ঘটেছে এরকম এলাকায় পশুচিকিৎসক, মাংসের দোকানদার, শিকারী, বন বিভাগের কর্মী এবং পশু ব্যবসায়ী, এদের জন্যও একই সুপারিশ করা হয়েছে। শিশুরা যেহেতু এই রোগের শিকার হয় বেশী তাদেরও দংশনপূর্ব ভ্যাকসিন দেওয়া উচিত।

সাদাটে শুকনো ওষুধটি ইনজেকশান দেওয়ার আগে সরবরাহ করা তরল দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয়—পরিবর্তিত হয় বেগুনী-লাল রঙের তরলে। স্ক্যাপুলার স্পাইনের তলায় (infrascapular fossa) চামড়ার গভীরে (deep subcutaneous) ইনজেকশান দিয়ে প্রবেশ করাতে হয়। বাহু এবং পাছার উপরিভাগের মাংসপেশীতেও দেওয়া যেতে পারে।

দংশনপূর্ব ক্ষেত্রে—প্রথম ইনজেকশান এবং এক মাস পরে একটি—এরকম মোট দুটি ইনজেকশান দিতে হয়। দুটি ইনজেকশানের পর শতকরা একশ ভাগ অ্যান্টিবডি প্রস্তুত হয়ে যায়। এর এক বছর পর একটি বুস্টার ইনজেকশান নিতে হয়। প্রথম দুটি ইনজেকশান এবং একটি বুস্টারের পর দীর্ঘ কয়েক বছরের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয়ে যায়, অনেকের মতে ২০-২৫ বছর। তবু প্রস্তুতকারক

সংস্থার সুপারিশ প্রতি তিন বছরে একটি করে বুস্টার ডোজ নেওয়া দরকার বিশেষত যাদের আশঙ্কা থাকে।

দংশন পরবর্তী চিকিৎসা (post exposure)—প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও চতুর্দশ দিনে মোট চারটি প্রাথমিক ইনজেকশান নিতে হয়। এরপর ত্রিশ দিন এবং নব্বুই দিনের মাথায় দুটি বুস্টার ইনজেকশান নিতে হয়, অর্থাৎ মোট ছয়টি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম দিন ২০ ই. ই (I. U) প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে হিউম্যান র‍্যাবিজ ইমিউনো গ্লোবিউলিন অথবা ৪০ ই. ই. প্রতি কিলোগ্রামে পিউরিফায়েড র‍্যাবিজ ইমিউনো সিরাম দেওয়া দরকার HCDS-এর সঙ্গে। যেখানে জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী সেখানে একেবারে দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রলেপ ও ইনজেকশান দেওয়া উচিত। HCDS-এর সঙ্গে হাইপার ইমিউন সিরাম দেওয়ার প্রয়োজন হবে কিনা, তা হয়তো আগামী দিনে আরো পরিষ্কার ভাবে জানা যাবে। যেহেতু HCDS ইনজেকশান নেওয়ার ৭ দিন থেকে অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়া (Antibody response) পাওয়া যায় এবং ১৪ দিনের মধ্যে অবশ্যই অ্যান্টিবডি গড়ে ওঠে ; হয়তো হাইপার ইমিউন সিরাম দেওয়ার আর প্রয়োজনই হবে না।

এই ভ্যাকসিন ব্যবহার করলেও প্রাথমিক চিকিৎসার কথাটা ভুললে চলবে না। ক্ষতস্থান সাবান দিয়ে ধুয়ে নিয়ে ৪০-৭০% অ্যালকোহল অথবা আয়োডিন সলিউশান লাগাতে হবে অথবা ০·১% কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম সল্ট লাগাতে হবে (অ্যামোনিয়াম সল্ট দিলে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সাবান আদৌ না থাকে। সাবান অ্যামোনিয়াম সল্টের ক্ষমতা হ্রাস করে)। এই ভ্যাকসিন ২° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটারে রাখা দরকার।

আগেই বলেছি এই ভ্যাকসিনের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। তবু যেটুকু অসুবিধা দেখা দিতে পারে তা হল—শতকরা দশভাগেরও কম ক্ষেত্রে স্থানীয় জায়গায় লাল হয়ে যাওয়া ও সামান্য বেদনা হতে

পারে—তা আবার ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমে যায়। অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে (শতকরা এক ভাগ) সামান্য জ্বর হতে পারে এবং তা একদিনের বেশী থাকে না।

আসল কথাটি এতক্ষণ বলা হয়নি। পাঠকেরা নিশ্চয়ই ভেবে বসেছেন এতই যখন সুবিধা এই ভ্যাকসিন নেওয়া যাক। বলছিলাম দামের কথাটা, প্রতিডোজের (অর্থাৎ এক সি. সি,) দাম ৩২৫.০০ টাকা। তাহলে ছ'টি ইনজেকশানের দাম কত পড়ছে আপনারাই হিসাব করে নিন। আঁতকে উঠবেন না যেন। আরো বড় কথা হোল এই ভ্যাকসিন বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। যদিও কোলকাতায় দু-একটি ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় তবু আপনার প্রিয়জনের অমূল্য প্রাণ বাঁচাতে এত খরচ করেও যথাসময়ে হয়তো পাবেন না আপনি।

সূত্র—প্রস্তুতকারী সংস্থা
(Institut Merieux, 17 Rue Bourgelat 69002 Lyon—France)

সম্প্রতি আর একটি ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে—Rhesus Diploid cell strain Rabies Vaccine (RDRV)। মানুষের ক্ষেত্রে জলাতঙ্ক বিরোধী এই ভ্যাকসিন উপযুক্ত ব্যবধানে মাত্র ৫টি ইনজেকশান দিলেই যথেষ্ট। HCDS-এর মতো, কি অ্যান্টিবডি প্রস্তুতিতে, কি কার্যকারিতায় সমান। অথচ দামে কম।

(সূত্র JIMA—Sept. 1983)

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় পাস্তুর ইনস্টিটিউট, কুনুর—বানরের কিডনির কোষ থেকে verocell tissue culture vaccine প্রস্তুতির কাজ হাতে নিয়েছেন। এই ভ্যাকসিন প্রস্তুত হলে খরচও পড়বে কম। যতদূর জানা গেছে প্রায় একশ টাকার মত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পিউরিফায়েড চিক এমব্রিও সেল র‍্যাবিজ ভ্যাকসিনের কথা। জার্মানীর Paul-Ehlich-Institut-

এর অনুমোদনে প্রস্তুত এই ভ্যাকসিন Rabipur বাণিজ্যিক নামে আমাদের দেশে চালু হয়েছে। দংশন পূর্ব ও দংশন পরবর্তী (Pre and post exposure) উভয় ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

দংশন পূর্ব প্রতিরোধ—ভেটেরিনারি সার্জেন. শিকারী, ল্যাবরেটরীর কর্মী ইত্যাদি ব্যক্তিকে ০, ৭, ২১ তম দিনে তিনটি ইনজেকশান নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রতিরোধ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একবছর পরে একটি এবং তু থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আর একটি বুস্টার ইনজেকশান নেওয়া দরকার।

দংশন পরবর্তী চিকিৎসা—দংশনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন। শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক সব ক্ষেত্রেই ৬টি ইনজেকশান, ০, ৩, ৭, ১৪, ৩০, ৯০ দিনে। বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেক ডোজ ১ সি. সি.। বাহুর মাংশপেশীর (deltoid) মধ্যে ইনজেকশন দেওয়া হয়। ইনজেকশান দেওয়ার ঠিক আগে গুড়ো ওষুধটি সরবরাহ করা দ্রবণে দ্রবীভূত করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়।

এই ভ্যাকসিন +২° সেঃ থেকে +৮° সেঃ তাপমাত্রায় রাখা দরকার। যাঁদের নিওমাইসিন (Neomycin), ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন (chlortetracycline) ও অ্যাম্ফোটারিসিন বি (Amphotericin B) অ্যান্টিবায়োটিক এবং মুরগীর ডিম বা প্রোটিনে অ্যালার্জি আছে তাঁদের এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত নয়।

শতকরা ৫ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ইনজেকশানের স্থানে অল্প ব্যথা, লাল হয়ে ফুলে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে মাথাধরা জ্বরজ্বর ভাব হতে পারে। এই ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় অন্য কোন রোগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন গ্রহণে কোন কুফল দেখা যায়নি।

একবার পূর্ণমাত্রায় ইনজেকশান নেওয়ার পর পুনরাক্রমণে—

একবছরের মধ্যে মাত্র একটি ইনজেকশান, এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দুটি ইনজেকশান ০, ৩ দিনে ; পাঁচ বছরের পর নতুন করে পূর্ণ মাত্রায় ৬টি ডোজ নিতে হয়।

[সূত্র ঃ—প্রস্তুতকারী সংস্থা Behring Hoechst India Ltd.]

জলাতঙ্কের চিকিৎসা—

জলাতঙ্কই বোধ হয় একমাত্র ভাইরাস জনিত রোগ যার পরিণতি মৃত্যু। রোগলক্ষণ প্রকাশ পেলে মৃত্যু অবধারিত। এই অবধারিত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণের কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত বেরোয়নি। আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে একজনই জলাতঙ্ক থেকে বেচেছেন বলে দাবী করা হয়েছে।[১] যতদূর জানা গেছে তা কোন বিশেষ ওষুধ দিয়ে নয়, শুধু মাত্র কিছু সহায়ক চিকিৎসা (Supportive treatment) এবং কৃত্রিমভাবে হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রকে চালিয়ে রেখে।

যেহেতু নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার লক্ষ্য হোল রোগীর যন্ত্রণাদায়ক কষ্টগুলি যতটা সম্ভব লাঘব করা। ২০০০ বছর আগে প্লিনি অ্যাট্রোপিন ও বেলেডোনা ব্যবহার করেছেন। তাতে হয়তো গিলতে পারার কিছু সুবিধা হোত। যে নিয়ম মেনে জলাতঙ্ক রোগীর চিকিৎসা হয় তা হোল মূলত সেবা। (নার্স যিনি সেবা করবেন তাঁর যেন ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে।)

রোগীকে খুব শান্ত ভাবে নির্জন ঘরে রাখা হয়, যেখানে আলো থাকবে কম, চিৎকারের শব্দ পৌছবে না, ঠাণ্ডা বাতাস লাগবে না। এ সবই উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং সমস্ত উত্তেজনাই তার খিচুনি বাড়িয়ে দেয়। জলাতঙ্ক রোগীর বেশী কথা বলার প্রবণতা থাকে—তার সঙ্গে বেশী কথা বলে অযথা তাকে বিরক্ত না করাই ভালো।

১। গিনেস বুক অব ওয়ালর্ড রেকর্ড'স ২১শ সংস্করণ, ১৯৭৪-এর এক রিপোর্টে পঁচিশ বছর বয়সী ব্রাজিলের এক মহিলা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বেঁচেছেন বলে জানা গেছে। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের এই ঘটনা। উনি পৃথিবীর একমাত্র রোগী যিনি এই রোগ থেকে বেঁচেছেন বলে ধারণা। ১৯৬৯ সালে ওখানে ৫১৫ জন আক্রান্ত রোগীর কাউকেই বাঁচানো যায়নি।

মরফিন দেওয়া হবে কিনা এই নিয়ে নানা মত আছে। ক্লোর-প্রোমাজিন ও প্যারালডিহাইড জাতীয় ওষুধ দিয়ে যতটা সম্ভব তার উত্তেজনা প্রশমন করা হয় এবং তার সমস্ত ধরনের কষ্টের অনুভূতি কমানোর চেষ্টা করা হয়। গিলে খেতে পারে না, তাই খাদ্যের পরিবর্তে শারীরিক পুষ্টি বজায় রাখার জন্য শিরার মাধ্যমে গ্লুকোজ দেওয়া হয়। আর দেওয়া হয় জীবাণুনাশক ওষুধ (antibiotic)।

তত্ত্বগতভাবে হাইপার ইমিউন সিরাম ও HCDS মস্তিষ্ক আক্রান্তকারী ভাইরাসকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর ফল পাওয়া যায় না।[১, ২]

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সুপারিশ করেছেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। জলাতঙ্কের চিকিৎসা হয় এরকম প্রায় কোন হাসপাতালে এসব ব্যবস্থা নেই। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা দ্বারা রোগীর মৃত্যুকে হয়তো সামান্য কিছু সময়ের জন্য পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে—বাঁচানো সম্ভব নয়। আর ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিয়ে তাকে শান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ার সাহায্য করা হয় মাত্র।

যাঁরা জলাতঙ্ক রোগীর সেবা করেন তাঁদের জন্য

মূল উদ্দেশ্য হবে জলাতঙ্কে আক্রান্ত রোগীর লালার সংস্পর্শে যেন না আসা হয়। যিনি তাঁর সেবা করছেন চিকিৎসক, নার্স বা বাড়ীর লোক যিনিই হোন না কেন তাঁকে অবশ্যই কতকগুলো সাবধানতা মেনে চলতে হবে—

তিনি খালিপায়ে রোগীর ঘরে ঢুকবেন না, শুশ্রূষাকারীর হাতে বা শরীরের অন্য কোনখানে যেন ক্ষত বা কাটা ঘা না থাকে। যদি নিতান্তই তাঁকে সেবা করতে হয় গ্লাভস ব্যবহার করা উচিত। রোগীর

১ Manson's Tropical Diseases 18th edition.

২ ডাঃ রায়চৌধুরী ও ডাঃ মোদক কোলকাতার সংক্রামক রোগ হাসপাতালের একটি রিপোর্ট দিয়েছেন JIMA Sept. 83-তে। জলাতঙ্ক রোগীদের হিউম্যান র‍্যাবিজ ইমিউনো গ্লোবিউলিন (৪০০ ই. ই—৬০০ ই. ই) দিয়ে তাঁরা দেখেছেন কাউকেই বাঁচানো যায়নি।

ব্যবহার্য সমস্ত প্রকার জিনিষ ও কাপড়চোপড় বীজাণুমুক্ত করা দরকার। শুশ্রূষাকারীর শরীরে কোনক্রমে রোগীর লালা লেগে গেলে বা রোগীকে খাওয়াতে গিয়ে দাঁতের কামড় লাগলে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

নির্মূল হোক এই রোগ

"পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় জলাতঙ্কের প্রাদুর্ভাব একই ভাবে রয়েছে যেমনটি ছিল প্রায় একশো বছর আগে" এ রিপোর্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO Press release 1966)। আমাদের "ভারতবর্ষে জলাতঙ্ক রোগে বছরে দেড়হাজার জন মারা যায়। আর বছরে ৩০ লক্ষ লোককে টানা ১৪ দিন কষ্টদায়ক প্রতিষেধক দিতে হয়। অসংখ্য অমূল্য জীবনহানি ছাড়াও ত্রিশ লক্ষ লোকের ইনজেকশান নিতে আসার জন্য কার্যদিন নষ্ট হচ্ছে ৪২০ লক্ষ দিন। এই বিপুল নষ্ট কার্যদিনে ক্ষতির পরিমাণ ১২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, আর যদি সরকারী আনুকূল্যে প্রতি ইনজেকশানের দাম পাঁচ টাকাও ধরা হয় তাহলে তা দাঁড়াবে দেড়কোটি টাকা প্রতিবছরে। এছাড়া আছে চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীর পারিশ্রমিক। এই রোগের শিকার মূল্যবান কয়েকটি জীব গরু, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়। একটি রোগের জন্য এত বিপুল ক্ষতি স্বীকার করতে হয় ভারতকে"। এটি মনগড়া কোন হিসাব নয়—১৯৭১ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিজিওনাল সেমিনারের রিপোর্ট।[১]

১৯৭১ থেকে আমরা আরো পনোরা বছর পেরিয়ে এসেছি। খরচও সেই তুলনায় বেড়ে গেছে কয়েক গুণ, মৃত্যুর হারও বেড়ে গেছে। এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের দেশে এই জীবন নাশা রোগের বিরুদ্ধে আমরা কতটা বিফল।

---

১ (JIMA Vol. 81, 1983)

এই রোগ দূর করতে গেলে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের বন্যজন্তুর, রাস্তার কুকুরের মধ্য থেকে এই রোগ দূর করা এবং গৃহপালিত পশুদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূর করা। বাস্তব ক্ষেত্রে বন্যজন্তুদের থেকে এই রোগ দূর করা অসম্ভব ব্যাপার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে জলাতঙ্কের প্রাদুর্ভাব বেশী সেই সব দেশে রাস্তার কুকুরকে মেরে ফেলা ও সমস্ত গৃহপালিত কুকুর ও বিড়ালকে প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্ক শহরকে জলাতঙ্ক মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়। কয়েক বছর আগে জাপানে সব কুকুর মেরে ফেলা হয়। মরা কুকুরগুলির চামড়া দিয়ে তৈরী হয় রকমারী শৌখীন জিনিষ। হাড় ও মাংস দিয়ে তৈরী হয় পশুদের খাবার। কুকুরের নতুন প্রজন্মের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের জলাতঙ্ক মুক্ত করার অঙ্গীকার নেওয়া হয়। বৃটেনে অন্যদেশের কুকুরকে প্রায় ঢুকতেই দেওয়া হয় না। দেশের প্রত্যেকটি কুকুরকে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। নিয়মিত অ্যান্টির‍্যাবিজ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। সেখানে সব কুকুরের লাইসেন্স ও হেলথ কার্ড আছে। আমেরিকায় মানুষের জলাতঙ্ক হওয়ার ঘটনা প্রায়ই নেই, যদিও বছরে প্রায় ৪০০০ জন্তুর র‍্যাবিজে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। বৃটেনের মতো অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং অন্যান্য ছোট ছোট দ্বীপে কোরেনটাইন আইনের জন্য এই রোগ আয়ত্তে আনা যাচ্ছে।

২০০০ বছর আগে চীনদেশেও পাগলা কুকুরের কামড় ও জলাতঙ্ক থেকে পরিত্রাণের কথা ভাবা হোত। Zuoquin Ming's Enlargement of the Spring and Autumn annals-এ উল্লেখ আছে খৃষ্টপূর্ব ৫৫৬-তে ডিউক জিয়াং-এর আমলে 'The people eliminated mad dogs'.

রোগ প্রতিষেধক সম্বন্ধে The Yellow Emperor's Canonof medicine-এ বলা হয়েছে—"একজন সুচিকিৎসক রোগের চিকিৎসার

আগে ভাববেন রোগ প্রতিরোধের কথা। একজন সুশাসক দেশেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, শান্তি আমদানী করেন না। একজন চিকিৎসক যদি 'রোগ হোক চিকিৎসা করবো' এবং একজন শাসনকর্তা 'বিদ্রোহ দানা বাঁধুক পরে দেখা যাবে' ভাবেন তবে তা পিপাসার্তকে দেখে কুয়ো খোঁড়া বা যুদ্ধ লাগার মুহূর্তে অস্ত্র বানাতে দেওয়ার শামিল হবে।"

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জন্তুর কামড় নিয়ে যেসব রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই কুকুরে কামড়ানো। তাই প্রথমে দরকার এই রোগের জন্য দায়ী কুকুরের সংখ্যা হ্রাস করা, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ও মালিকহীন ভবঘুরে কুকুরকে ধ্বংস করা। সমস্ত পালিত কুকুরকে রেজিষ্ট্রেশান-এর আওতায় আনা। জনবসতি এলাকাকে কুকুরহীন করা। কুকুর ও অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীকে প্রতিষেধকের আওতায় আনা। যে-সব গৃহপালিত বিড়াল ও কুকুরকে অন্য পাগলা জন্তু কামড়েছে তাদের ধ্বংস করা। পালিত জন্তুদের জন্য উপযুক্ত প্রতিষেধক ও এই রোগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করা।

কুকুর ও অন্যান্য জীবজন্তু নিয়ে কাজকর্ম করেন বেলগাছিয়ার ইনষ্টিটিউট অব অ্যানিম্যাল হেলথ্ অ্যাণ্ড ভেটেরিনারী বায়োলজি-ক্যালস। র‍্যাবিজ রোগের কারণ ও কুকুরের মধ্যে এই রোগের পরিবহন সম্বন্ধে এখানে কাজ হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে কুকুরদের জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। কোলকাতা শহরের ৫০০০ পোষা কুকুরকে অ্যান্টির‍্যাবিজ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল। ঐ গুলির জলাতঙ্ক হওয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে কোনটিই জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়নি। এখানে বছরে প্রায় আড়াই হাজার জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা তৈরী করা হয়। প্রত্যেকটির দাম দশ টাকা এবং তা পশুচিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্র অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

১৯৭৭ সালে কোলকাতার পাস্তুর ইনষ্টিটিউট থেকে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ঐ বছর কোলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তার

কুকুরের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার। কোলকাতা কর্পোরেশনের হিসাবে বর্তমানে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দু-লক্ষ। পুরসংস্থার 'ডগ স্কোয়াড'—কুকুর ধরার সেল সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিযোগ শোনা যায়। তাঁরা নাকি ঠিকমত কুকুর ধরলে রাস্তার কুকুর কামড়ানোর ঘটনা কমে। কমে আনুসঙ্গিক সব ঘটনা। পুরসংস্থার কর্মীদের রাস্তায় সাঁড়াশী দিয়ে কুকুর ধরতে দেখা যায়। এরা শুধু স্ত্রী কুকুর ধরে, তাও কুকুরের পেটে বাচ্চা থাকলে মানবিক কারণে ধরা হয় না।

কর্মীরাও সব সময় শহরবাসীর সহযোগিতা পান না।

কুকুর ধরার সেল

কলকাতা পুরসভার কুকুর ধরার সেলটি খুবই নড়বড়ে। ১ হগ স্ট্রিটের অফিসে গেলেই তা বোঝা যাবে। ওখানকার এক ইনসপেক্টরের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সারা শহরে পুরসভার ১৪১টি ওয়ার্ডের জন্য কুকুর ধরার গাড়ি মাত্র একটি। মান্ধাতা আমলের। ওই সবেধন নীলমণিটি আবার খারাপ থাকে। ড্রাইভার একজন। কুকুর ধরার যন্ত্রপাতি সেই সাবেকী আমলের। গাড়ির পেট্রোলের কোটা নির্দিষ্ট।

এখান সেখান থেকে রোজই 'কল' থাকে। কিন্তু সব সময় লোকজন জোগাড় করে দিনকাল দেখে—নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছান যায় না। তার ওপর খাঁচাও ১০-১২ খানা। ড্রাইভার একই জায়গায় ২বার ট্রীপ দেয় না।

মাসে কত কুকুর ধরা হয়? প্রশ্ন করতেই ভদ্রলোক চমকে গেলেন। বললেন, সঠিক হিসাব বলতে পারব না। বলতে মানা। কুকুর ধরে কোথায় পাঠান হয়। ১৯৫তে। তার মানে? ১৯৫, লোয়ার সার্কুলার রোড। ওখানে কুকুরের খোঁয়াড় আছে। তা হলে নিশ্চয়ই প্রতি মাসে হাজার খানেক কুকুর ধরা হয়? ভদ্রলোক বললেন —মোটেই না। তারপর বললেন, শহরের কুকুর আমাদের লোকজন ও গাড়িটা চিনে ফেলেছে। গাড়ি

আসছে দেখলেই কুকুরগুলো যে কোথায় গা ঢাকা দেয়।
জানা গেল, কুকুর ধরার ঝক্কিও অনেক। কোন রাস্তার কুকুর ধরলেই -পাড়ার লোক ছুটে আসে। বলে, কালুকে ধরেছেন ওকে ছেড়ে দিন। ওটা আমাদের পোষা কুকুর। জনগণের দাবি—তাই কালুকে ছেড়ে দিতে হয়। বললাম, পুরসভার আইনে পোষা কুকুরের তো লাইসেন্স দরকার। ভদ্রলোক বললেন—আইন তো আছে। কিন্তু মানছে কে? সবারই তো একটি নীতি "মানছি না, মানব না।" আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৬

জানা গেছে পুরকর্তৃপক্ষ শহর থেকে কুকুর কমানোর চেষ্টা করছেন ও কুকুর ধরার নতুন গাড়ি কেনা হচ্ছে। এন্টালী ছাড়াও সল্টলেকে কুকুর ধরে রাখার বিশাল জায়গার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয়েছে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিহত করতে হলে দরকার (১) স্বাস্থ্যশিক্ষা (২) কুকুর ও অন্যান্য পশুর বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তি যাতে সরকার প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নিতে পারেন। (৩) পোষা কুকুরের বাধ্যতামূলক প্রতিষেধক নেওয়ার ব্যবস্থা করা। (৪) প্রতিষেধক না নেওয়া এবং রাস্তার কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা (৫) পরীক্ষাগারে রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার প্রচলন করা ইত্যাদি।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে কুকুর নিধন বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে র‍্যাবিজ নির্মূলের সহায়ক হলেও এতে প্রকৃতিক ভারসাম্যহীনতা (ইকোলজিক্যাল ইমব্যালান্স) দেখা দেবে। এটি মোটেই যুক্তি গ্রাহ্য কথা নয়। রাস্তার কুকুরগুলোকে ধ্বংস করা এবং পুরসংস্থা ও শহরবাসীদের সহযোগিতা একত্র করে মাস ইমুনাইজেশনের ব্যবস্থা করা র‍্যাবিজ রোগ নিবারণের আর একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা। এর জন্য চাই সকলের সহযোগিতা ও সরকারী উদ্যোগ।

বৃটেনের ছুটি সংগঠন—'রয়াল সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশনস অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমেলস' এবং 'দি ওয়ার্লড সোসাইটি ফর দি প্রোটেকশান অব অ্যানিমেলস' এর সমর্থনপুষ্ট কোলকাতার 'ফ্রেণ্ডস অব ডগ্‌স' সংস্থাটি এগিয়ে এসেছেন স্ত্রীকুকুরদের নিবীর্য করানোর কর্মসূচী নিয়ে। যার ফলে কোলকাতার রাস্তার কুকুরের সংখ্যা কমতে থাকবে। এর সঙ্গে স্ত্রীকুকুরদের র‍্যাবিজের টিকাও দেওয়া হচ্ছে। তাদের এই কর্মসূচীতে রাস্তার কুকুরের সংখ্যা তো কমবেই অন্যদিকে জলাতঙ্কের জীবাণু বহনকারীদের সংখ্যাও কমে যাবে।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে আরও প্রয়োজন কুকুর কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরবর্তী সময়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিষেধক নেওয়া ও অন্যদিকে ব্যাপক প্রচার চালানো। (মাদ্রাজ শহরে 'কুকুর থেকে জলাতঙ্ক হয়' এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে)। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো উচিত যাতে মানুষ ওঝা বা গুনিনের খপ্পরে পড়ে অযথা দেরী না করে। গ্রামাঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে অনেক সময়ই জলাতঙ্কের প্রতিষেধক সরবরাহ থাকে না। সংরক্ষণের ব্যবস্থাগুলিও ত্রুটিপূর্ণ। তাপমাত্রার হেরফেরেও ভ্যাকসিনের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান চালু ভ্যাকসিনের তুলনায় অনেক বেশী কার্যকরী ভ্যাকসিন হল হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল কালচার ভ্যাকসিন, কিন্তু প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ এবং সহজে পাওয়া যায় না। এই ভ্যাকসিন আরো সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ডগ কণ্ট্রোল প্রোগ্রাম ঠিকমতো কার্যকরী করা গেলে ভ্যাকসিনের চাহিদাও কমত। ভ্যাকসিন প্রস্তুতিতে স্ত্রীভেড়ার ব্যবহারে স্ত্রীভেড়ার সংখ্যা কমছে এবং সামগ্রিকভাবে ভেড়ার জন্মহারও কমে যাচ্ছে।

সূত্র—(১) আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৬

(২) PSM—Park & Park

আপনার আদরের কুকুরটি কতটা নিরাপদ!

মেয়েটির হাতে একটি সাদা রোমশ কুকুর। সুন্দর। জুলজুল চোখে আপনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আপনার খুব ইচ্ছে করছে ওর লোমশ গায়ে হাতে দিয়ে আদর করতে। আপনি করলেনও। কিন্তু অবোধ ঐ সারমেয় সন্তানটি যদি তার পায়ের নখ দিয়ে আপনার আদরের প্রতিদান দেয় বা আপনার হাতের বিস্কুট নিতে গিয়ে লালা ঝরিয়ে দেয়? আপনি হয়তো ব্যাপারটায় তেমন আমল দিলেন না। কিন্তু এমনওতো হতে পারে ঐ কুকুরটি তার আকর্ষণীয় শরীরের গভীরে জীবননাশী জলাতঙ্কের 'বিষ' বহন করছে। আপনাকে জেনে নিতে হবে ভদ্রমহিলা তাঁর সন্তানতুল্য জীবটিকে নিয়মিত ভ্যাকসিন দেন কিনা।

কুকুর জলাতঙ্কের ভাইরাস বহন করে। বন্যজন্তু থেকে মানুষের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তাই পোষা কুকুরকে সব সময় প্রতিষেধক দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের পশুপালন দপ্তর (যুগ্ম অধিকর্তা, অ্যামালগ্যামেটেড স্কিম—বেলগাছিয়া, কোলকাতা) যে ভ্যাকসিন প্রস্তুত করেন তা দংশনপূর্ব ও দংশনপরবর্তী উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

দংশনপূর্ব (pre-exposure) ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পোষা কুকুরকে যে ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তা হোল 20% sheep brain suspension ৫ সি-সির একটি মাত্র ইনজেকশান চামড়ার তলায় (subcutaneous) দেওয়া হয়। ৬ মাস অন্তর এই ভাবে প্রতিষেধক দেওয়া হয়।

দংশন পরবর্তী (post exposure) সময়ে 5% sheep brain suspension কুকুর ও অন্যান্য সব পোষাজীবকে দেওয়া হয়। যদি জন্তুটির ওজন ৩০ পাউণ্ডের কম হয় ২ সি সি হিসাবে ১৪ দিন, ৩০ পাউণ্ড থেকে ১০০ পাউণ্ড ওজনের পোষাজীবকে ৫ সি সি হিসাবে ১৪ দিন, আরো বেশী ওজনের যেমন গাধা মোষ, গরু ইত্যাদিকে ওজন অনুযায়ী দেওয়া হয়। এই ভ্যাকসিনের দাম আনুমানিক দশটাকা।

এছাড়া অন্যান্য যে ভ্যাকসিন পাওয়া যায় তা হোল—১· ফ্লুরি ভ্যাকসিন (Flury)—

(ক) ফ্লুরি স্ট্রেন এল. ই. পি (Low egg passage) ভ্যাকসিন কুকুরদের দংশনপূর্ব ক্ষেত্রে প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার হয়। ৬ মাস বয়সে পাছার মাংসপেশীর গভীরে ২ সি সি ইনজেকশান দেওয়া হয়। যদিও প্রথম ইনজেকশানের পর প্রতিরোধ ক্ষমতা তিন বছর থাকে. তবে উচ্চ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এক বছর অন্তর পুনরায় ইনজেকশান দেওয়া যেতে পারে।

এই ভ্যাকসিন সংরক্ষণের ব্যাপারে যত সচেষ্ট হওয়া যায় ভ্যাকসিনের ক্ষমতা তত বেশীদিন থাকে। ০° সেন্টিগ্রেডের কম তাপমাত্রায় ৯ মাস, ৪° থেকে ১০° সে তাপমাত্রায় ৯০ দিন এবং ২০° সে তাপমাত্রায় রাখা হলে ৫ দিন থাকে। এই ভ্যাকসিনের আনুমানিক দাম ২০ টাকা।

(খ) ফ্লুরি স্ট্রেন এইচ. ই. পি (High egg passage)—

এই ভ্যাকসিন দংশনপূর্ব এবং দংশনের পর উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। দংশনপূর্ব ক্ষেত্রে ২ সিসি পাছার মাংসপেশীরগভীরে তিনমাস বয়সে দেওয়া হয়। যদিও প্রতিরোধ ক্ষমতা দুবছর থাকে তবু যে সব অঞ্চলে র‍্যাবিজ এর ঘটনা বার বার ঘটে বা সন্দেহজনক ক্ষেত্রে উচ্চ প্রতিরোধক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বছরে একবার ইনজেকশান দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। দংশনের পর—২ সি সি হিসাবে ৭ দিন ইনজেকশান দেওয়া হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে দংশনপূর্ব প্রতিষেধক দেওয়া থাকলে মাত্র একটি ডোজ দেওয়া হয়।

এই ভ্যাকসিন ৪° থেকে ১০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক বছর রাখা যায়।

২. সিরাম ইনস্টিটউট অব ইনডিয়ার ভেটেরিনারি বিভাগ কুকুরের দুরকম ভ্যাকসিন তৈরি করেন—

(ক) Rabisin –শুধুমাত্র র‍্যাবিজের জন্য,

(খ) Pentadog—ক্যানাইন হেপাটাইটিস, ডিসটেমপার, লেপ্টোস্পাইরোসিস ও র‍্যাবিজের জন্য।

ভ্রান্তধারণা ও কিছু প্রশ্ন

আমার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ীর পুরোহিতের ছেলেকে কুকুরে কামড়ায়। প্রথমে উনি গ্রামের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী ওঝার কাছে নিয়ে যান। ওঝা তার কর্তব্য করে। তবে আমার ঐ আত্মীয়ের বার বার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত পুরোহিত মশাই ছেলেটিকে নিয়ে হাসপাতালে যান। যথারীতি ১৪টি ইনজেকশান হয়। আমার আত্মীয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কিন্তু অল্প কদিন পরেই ছেলেটির শরীরের একদিক পুরো অবশ হয়ে যায় (অর্থাৎ প্যারালিসিস)। পুরোহিত আজও আমার আত্মীয়কে দোষারোপ করেন ওঝা ঠিকই বিষ নামিয়ে দিয়েছিল, বিষহীন শরীরে ইনজেকশান দেওয়ার জন্য এরকমটি হোল। আমার আত্মীয়টিও নিজেকে অপরাধী ভাবেন। তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পুরোহিত বাড়ীর এই ঘটনা তাঁকে কিছুটা ভাবিয়ে তোলে। তাঁর মতো অনেকেই 'বিষ' না থাকলে ইনজেকশান নিলে কোন ক্ষতি হবে কিনা ইত্যাদি নানা চিন্তার সম্মুখীন হন যখন তাঁদের নিকট কোন আত্মীয় কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হয়। আমি এখানে এই ধরনের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রথম উত্তর আমার আত্মীয়ের সেই প্রশ্নটির—

পুরোহিতের ছেলের প্যারালিসিস হওয়া ভ্যাকসিনের একটি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'বিষ' থাকুক বা না থাকুক এই প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সুস্থ মানুষ যাকে কুকুরে কামড়ায়নি তারও যেমন হতে পারে তেমনি হতে পারে পাগলা কুকুরের কামড়ে মারাত্মক ভাইরাসে জর্জরিত মানুষের ক্ষেত্রেও। তবে এই ঘটনা অতি অল্প জনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। (ভ্যাকসিন প্রতিক্রিয়ার কথা আগে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)। সাপে কামড়ানো রোগীর anti snake venom নেওয়ার ব্যাপারেও অনেকে এই ধরনের প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন, দুই—জলাতঙ্ক রোগীর এঁটো খেলে ভয় আছে কিনা—এই রকম প্রশ্ন নিয়ে অনেকেই আসেন. বিশেষত বাড়ীর কেউ জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার পর। বাড়ীর কাউকে কুকুরে কামড়ে ছিল তার এঁটো খেয়েছে কেউ কেউ, আক্রান্ত ব্যক্তিটির জলাতঙ্ক হওয়ার পরই শুরু হয়ে যায় চিন্তা। যে গেছে সে তো গেলই বাকীদের কি হবে? আরো প্রশ্ন হয় জলাতঙ্ক রোগীর যারা সেবা যত্ন করেছেন তাঁদের?

উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর প্রতিষেধক চিকিৎসা নেওয়া উচিত। কারণ—'জলাতঙ্কের ভাইরাস অক্ষত মিউকাস মেমব্রেন এবং খাদ্যনালী দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।' এ রিপোর্ট বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালের, ১৯৭০ (সূত্র—Manson's tropical diseases)।

প্রশ্ন, তিন—আর এক ধরনের প্রশ্ন হয় যাদের বাড়ীতে গরু আছে সাধারণত তাঁদের থেকে আসে এ প্রশ্নটি। পাগলা জন্তুর কামড়ের পর র‍্যাবিজ হোল গরুটির। তখনই প্রশ্ন আসে—সেই গরুর দুধ যারা খেয়েছে বা যিনি গরুটির সেবা করেছেন তাঁদের কি করা উচিত। যদি দুধ ফুটিয়ে খাওয়া হয়ে থাকে কোন ভয় থাকে না। আর যাঁরা সেবা করেছের তাঁদের হাতে যদি কোন ঘা বা হাজা ইত্যাদি না থাকে তবে প্রথম শ্রেণীর এবং ঘা বা হাজা থাকলে অবস্থা অনুযায়ী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষেধক নেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন, চার—জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষ কামড়ালে কি জলাতঙ্ক হতে পারে?

জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষ কামড়াতে চায় এটি ঠিক নয়। ঘটনাচক্রে রোগীকে খাওয়াতে গিয়ে কোন ক্রমে যদি তার দাঁত শুশ্রূষাকারীর হাতে ক্ষত সৃষ্টি করে তারও জলাতঙ্ক হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে প্রতিষেধক অবশ্যই নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন, পাঁচ—বানর কামড়ালে ভ্যাকসিন নিতে হবে কি? পোষা বানরের পাগলা কুকুরের সংস্পর্শে আসার বা তার কামড় খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পোষা বানর কামড়ালে হেলাফেলা করা উচিত

নয়। সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। এবং দশদিন লক্ষ্য রাখার ব্যাপার ইত্যাদি একই রকম হবে। আর গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো বানর হলে তার কুকুর বা অন্য বন্যজন্তুর সংস্পর্শে আসা প্রায়ই অসম্ভব। একমাত্র vampire bat দ্বারাই তারা আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে সে প্রশ্ন আসে না। তাই এক্ষেত্রে ভ্যাকসিন নেওয়ার যুক্তি নেই। খরগোস গিনিপিগ যেহেতু মাটিতে ঘুরে বেড়ায় তা সে পোষাই হোক কি বন্য হোক সম্ভাবনা থাকে র‍্যাবিজ জন্তুর সংস্পর্শে আসার। তাই এদের কামড়ে ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। ইঁদুর ছুঁচো থেকে জলাতঙ্ক হওয়ার নজির নেই। এদের কামড়ে এই ভ্যাকসিন নেওয়ার প্রয়োজনও নেই।

প্রশ্ন,ছয়—কামড়ের কয়েক বছর পর জলাতঙ্ক হতে পারে কি? জলাতঙ্ক বেশী দেখা যায় ৩ মাস থেকে ৬ মাসের মধ্যে। কামড়ের এক বছরের মধ্যে জলাতঙ্ক হওয়ার ঘটনা ঘটে। এর পরে সাধারণত দেখা যায় না। দু বছরের মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে এবং তা হয় অসম্পূর্ণ কোর্স, কম ডোজ ইত্যাদির জন্য।

প্রশ্ন,সাত—যারা ভ্যাকসিন নেয়নি তাদের জলাতঙ্ক হবেই?

—জন্তুর সব কামড়েই ভাইরাস দংশিত প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে না। অর্থাৎ সব কামড়ই যে বিষময় হবে তার কোন মানে নেই। তার মানে এই নয় যে 'বিষ' নাও থাকতে পারে এই ধরে নিয়ে বসে থাকা হবে। দক্ষিণ ভারতের কুন্নুরের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের এক রিপোর্টে (১৯৬৯) দেখা গেছে যারা ইনজেকশান নেয়নি তাদের মধ্যে শতকরা ৫৬ ভাগের ক্ষেত্রেই রোগ দেখা দিয়েছে। বাকীদের ক্ষেত্রে এই রোগ দেখা নাও দিতে পারে তবে একবার হলে তো আর কোন উপায় নেই মৃত্যু মেনে নেওয়া ছাড়া। তাই সন্দেহজনক কোন অবস্থাতেই ইনজেকশান নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

প্রশ্ন,আট—যারা ইনজেকশান নিয়েছে তাদের কি জলাতঙ্ক হতে পারে।

সাধারণত ইনজেকশান নিলে জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তবে হতে পারে না এমন নয়। হলেও তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। কুনুরের পাস্তুর ইনষ্টিটিউট ১৯৬৯ সালে একটি সমীক্ষা চালিয়ে এরকম কয়েকটি নজির পেয়েছেন। Indian Medical Association-এর জার্নালে এই রকম কয়েকটি ক্ষেত্রে জলাতঙ্ক হওয়ার উল্লেখ আছে। দেরীতে ইনজেকশান নিতে আসা, হাইপার ইমিউন সিরাম না নেওয়া বা যে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তার কার্যকারিতা (potency) নষ্ট হওয়াই এ সবের সম্ভাব্য কারণ।

প্রশ্ন,নয়—যাঁরা ভ্যাকসিন চিকিৎসা অসম্পূর্ণ করেছেন তাঁদের এই রোগ হতে পারে কিনা ?

অবশ্যই সে সম্ভাবনা থেকে যায়। এমন ঘটনা ঘটেছে জলাতঙ্ক রোগীর আত্মীয়স্বজন বলেছেন প্রতিষেধক নিয়েও সে আক্রান্ত হোল কেন ইত্যাদি। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে তাঁরা প্রতিষেধক অসম্পূর্ণ করেছেন। কোলকাতায় ২৭৯ জন জলাতঙ্ক রোগীর ওপর সমীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে ৫·৩ শতাংশ চিকিৎসা সম্পূর্ণ করেন নি। তাঁদের কেউই রেহাই পাননি।

প্রশ্ন,দশ—জলাতঙ্ক রোগীর ভ্যাকসিন নিয়ে কোন লাভ হয়কি ?

একবার জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভ্যাকসিন দিয়ে কোন লাভ হয় না। কোলকাতার সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে কয়েকজন রোগীকে আধুনিক প্রতিষেধক হিউম্যান র‍্যাবিজ ইমিউনো গ্লোবিউলিন দিয়ে দেখা গেছে কাউকেই বাঁচানো যায়নি। এমনকি তাদের জীবন সীমাও বাড়ানো যায়নি। দশদিনের বেশী কোন রোগী বাঁচেনি।

প্রশ্ন,এগার—প্রসূতিকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে কিনা ?

—প্রসূতি অবস্থায় ভ্যাকসিন দেওয়ার কোন বাধা নেই তবে পেটে অর্থাৎ নাভির চারপাশে দেওয়া হয় না। তাদের ক্ষেত্রে উরু বা স্ক্যাপুলার নীচে দেওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন,বার—কোন মাকে প্রতিষেধক দেওয়াকালীন উনি বাচ্চাকে স্তন্য দেবেন কিনা ?

তাতেও কোন বাধা নেই। যদি কোন ক্রমে জলাতঙ্কের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে শিশুকে স্তন্য দান করা।

প্রশ্ন,তের—ভ্যাকসিন চিকিৎসা চলাকালীন জ্বর ইত্যাদি হলে চিকিৎসা বন্ধ থাকবে কিনা ?

চিকিৎসা চলাকালীন যদি জ্বর জাতীয় কোন রোগ হয় চিকিৎসা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার শুরু করে দেওয়া হয়। ১৪টি ইনজেকশান ২১ দিনের মধ্যে নিয়ে নেওয়া ভালো। যদি বেশী দেরী হয় তবে শেষ ইনজেকশানের ৭ দিন পরে এবং তার ১৪ দিন পরে একই ডোজে মোট দুটি বুস্টার ইনজেকশান নিতে হয়।

প্রশ্ন,চৌদ্দ—অন্য কোন কঠিন রোগ যেমন ডায়াবিটিস, হৃদরোগ ইত্যাদি থাকলে ভ্যাকসিন দেওয়ার কোন বাধা আছে কি ?

ঐ সমস্ত রোগে ভ্যাকসিন দেওয়ার কোন বাধা নেই। তবে অ্যালার্জী থাকলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। প্রয়োজনে অ্যান্টিঅ্যালার্জীক ওষুধ দিতে হয়।

প্রশ্ন,পনেরো—কোন প্রসূতি মায়ের জলাতঙ্ক হলে তার গর্ভস্থ সন্তানেরও কি জলাতঙ্ক হবে ?

জলাতঙ্কের ভাইরাস প্লাসেন্টা দিয়ে প্রবেশ করে না। ১৯৬০ সালে একটি রিপোর্টে দেখা যায়—'সাত মাসের প্রসূতি মা জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার সময় সিজারিয়ান অপারেশন করে প্রসব করানো—নবজাত শিশু ঐ রোগ থেকে মুক্ত ছিল।

(সূত্র—Manson's Tropical Disease)

প্রশ্ন,ষোল—অনেকে প্রতিষেধক খালি পেটে নেওয়ার পরামর্শ দেন—এটি কি ঠিক ?

প্রতিষেধক খালি পেটে যাঁরা নিতে বলেন তাঁরা হয়তো ভাবেন যেহেতু পেটে ইনজেকশান নেওয়া হয় পেট খালি থাকলে সুবিধা হবে, পেটের চামড়া ধরে ইনজেকশান দিতে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। বরং খাওয়ার পর ইনজেকশান নেওয়াই ভালো। খালি পেটে নিলে vasovagal attack হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্ন,সতের—ঠিক প্রশ্ন নয়, একটি ভ্রান্ত ধারণার কথা জানিয়ে রাখি। অনেক সময় অভিভাবক তাঁর ছোট শিশুকে পেট ব্যথার চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন এবং অন্যান্য ইতিহাসের সঙ্গে দীর্ঘদিন আগে কুকুরে কামড়ানোর ইতিহাস বলেন। পরীক্ষা করে দেখা যায় কৃমির জন্য কি অন্য কোন কারণে পেট ব্যথা। আসলে দীর্ঘদিনের ভ্রান্ত ধারণার জন্য অনেকে মনে করেন কুকুরে কামড়ালে বুঝি পেট ব্যথা হয়। আবার কুকুরে কামড়ানোর কিছুদিন পর যদি কারো পেট ব্যথা হয় তারা মনে করেন এটি হয়তো জলাতঙ্ক রোগের পূর্ব লক্ষণ। জলাতঙ্ক বা কুকুরে কামড়ানোর সঙ্গে পেট ব্যথার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন.আঠারো—এবার শেষ প্রশ্নের উত্তর। কিছুদিন আগে আমার কাছে এক রোগী আসেন ঝগড়াঝাটির সময় তাঁকে তার ভাই কামড়ে দেয়। প্রাথমিক চিকিৎসা হয়ে গেল যথারীতি। এবার রোগীটি চাপ দিতে থাকেন তাঁকে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য। নানা ভাবে বোঝানো হোল মানুষে কামড়ালে ভয় নেই, তবু কিছুতেই শুনতে চান না। অবশেষে তিনি শেষ অস্ত্র ছাড়লেন—ভাইটির মাথায় নাকি একটু ছিট্ আছে, যেহেতু পাগল—এবার দিতেই হবে। যখন আরও বুঝিয়ে নিরস্ত করা গেল না আমার সহকর্মী আমার হয়ে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন—"আপনার ভাই কি ঘেউ ঘেউ করে? তার কি চারটে পা ও একটি লেজ আছে? তবে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে দশদিন লক্ষ্য রাখুন।"

হেসে ফেলেছিল লোকটি। আর আসেনি।

---

* (অবশ্য জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষ থেকে অন্য মানুষে রোগ সংক্রমিত হতে পারে সে কথা আগেই বলা হয়েছে)

অবহেলার আর এক নাম মৃত্যু

সারা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন হাসপাতালে জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বছরে হাজার হাজার রোগী কুকুর বা বন্যজন্তুর কামড় খেয়ে হাসপাতালে আসেন। চিকিৎসার জন্য আসেন নানা শ্রেণীর, নানা বয়সের মানুষ। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যাঁরা চিকিৎসার জন্য আসেন তাঁদের অধিকাংশই কুকুরে কামড়ানো। প্রতিষেধকের জন্য অনেক দেরী করেই আসেন অনেকে। অধিকাংশই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেন না। এক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব সবাই প্রায় সমান। যখন বাড়ীর কাছাকাছি বা নিকটবর্তী কোন গ্রামে বিশেষ কেউ জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তখনই টনক নড়ে বেশী। সে সময়ই নানা জনে আসতে থাকেন তাঁদের বিভিন্ন সময়ে কামড়ের ইতিহাস নিয়ে। কারো একমাস, ছয়মাস এমনকি কয়েক বছর আগে কামড়েছে এরকম ইতিহাস নিয়ে হাজির হন তাঁরা। অনেকেই ওঝা দিয়ে ইতিমধ্যে পিঠে থালা বসিয়েছেন, স্বভাবতই ওঝারাও তাদের 'রোগ নির্ণয় করে' দেয় থালা বসিয়ে। 'বিষ থাকলে' কেউ ওঝার ওষুধ খান কেউ কেউ ওঝার কাছে রোগ নির্ণয় করে ছুটে আসেন হাসপাতালে। ওঝার থালা থেরাপিতে যাদের 'বিষ' থাকে না তারা হাসপাতালে আসে না। আসে না প্রতিষেধকের আওতায়। দেরী করে আসার জন্য বা আদৌ না আসার জন্য জলাতঙ্কের ভাইরাস ক্ষতস্থান থেকে মস্তিষ্কের কোষে জমতে থাকে। রোগ শুরু হয়—যার পরিণতি অবধারিত মৃত্যু।

সারণি—বেলেঘাটার সংক্রামক রোগ হাসপাতালে গত দশ বছরে জলাতঙ্কে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও তাদের পরিণতি লক্ষ্য করুন—

সাল	ভর্তি	মৃত্যু
১৯৭৬	১১৫	১১৫
১৯৭৭	১৩৭	১৩৭

১৯৭৮	১৪২	১৪২
১৯৭৯	১৫৫	১৫৫
১৯৮০	১৪৪	১৪৪
১৯৮১	১৬২	১৬২
১৯৮২	১৬৬	১৬৬
১৯৮৩	১৪৫	১৪৫
১৯৮৪	১৪২	১৪২
১৯৮৫	১৪৯	১৪৯

এ তো গেল শুধু বেলেঘাটা আই. ডি. হাসপাতালের হিসাব। শুধুমাত্র কলকাতা শহর বা শহরতলী অঞ্চল থেকে আসা রোগীর সংখ্যা ও তাদের পরিণতি দেখলে আন্দাজ করা যায় সারা পশ্চিমবাংলার অবস্থা সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে সরকারী ব্যবস্থায় জলাতঙ্ক রোগীকে চিকিৎসার জন্য এখানে আনা সম্ভব হয় না। অনেকে রোগীর নিশ্চিত মৃত্যু জেনে নানা ঝক্কি ঝামেলা পোয়াতে চান না। তাই গ্রামাঞ্চলের রোগীর সংখ্যা এই পরিসংখ্যানের বাইরে থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪০০ হাসপাতালে গড়ে বছরে কম পক্ষে একজন জলাতঙ্ক রোগী মারা গেলে সংখ্যাটা সব মিলিয়ে ৫০০ ছাড়িয়ে যায়। এছাড়া আছে হাসপাতালে না আসা রোগীর সংখ্যা—যাদের সব সময় রোগ নির্ধারণও হয় না। এবং রেকর্ডও থাকে না কোন। কোন পরিসংখ্যানে তাদের উল্লেখ থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে বছরে প্রায় ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোককে কুকুরে কামড়ায়। তার মধ্যে ২০ হাজারই কলকাতার।

JIMA Vol. 81-এর এক রিপোর্টে দেখা গেছে ২৭৯ জন জলাতঙ্কে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ২৪২ জন (৮৬·৭%) ভ্যাকসিন নেয়নি, ১৬জন (৫·৩৭%) অসম্পূর্ণ কোর্স নিয়েছে, বাকি ২১ জন চিকিৎসা সম্পূর্ণ করেছে। যারা ভ্যাকসিন নেয়নি তাদের মৃত্যুতে আত্মীয় স্বজনরা হয়তো কপালের লিখন বা ভগবানের দোহাই দিয়েছেন। কিন্তু যাদের ইন-জেকশান নেওয়া সত্ত্বেও ঐ রোগ হোল তাদের দেখা গেছে ঐ রোগীরা

কেউই হাইপার ইমিউন সিরাম বা বুস্টার ডোজ নেয়নি। সমীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে কামড়ের অনেক পরে (এমনকি একমাস পর্যন্ত) চিকিৎসা নিতে আসা জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।

আমেদাবাদের ভি. এস. জি. হাসপাতালের ডাঃ ত্রিবেদি সমীক্ষা করে দেখেছেন দুই-তৃতীয়াংশ রোগী ভ্যাক্সিনের কোর্স সম্পূর্ণ করেনি।[১]

পুরুষ—৬৩·৫%
মহিলা—৭১·২%
শিশু—৬৯·৪%

শতকরা দশজন একটির বেশী ইনজেকশান নেয়নি। তাঁর মতে আমাদের চালু ভ্যাকসিনের ব্যথাদায়ক ও আনুষঙ্গিক নানা ঝঞ্ঝাটের জন্যই এই বিপত্তি।

"সারা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন প্রতিষেধক কেন্দ্র তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী ভ্যাকসিন সংগ্রহ করেন পাস্তুর ইনষ্টিটিউট থেকে হয় ডাক যোগে নয় প্রতিনিধি মারফৎ। সংগ্রহের পর সংরক্ষণের ব্যাপারে দেখা গেছে তাদের সুপারিশ মতো ৪°-১০° সেঃ তাপমাত্রায় রাখা হয় না। কোথাও বা ফ্রিজ ব্যবহার হয় কিন্তু ষ্টীলের আলমারিতে রাখা থাকে বেশী জায়গায়। ফলে তাপমাত্রার হেরফের এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। অথচ দেখা গেছে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমলেও স্নায়বিক পক্ষাঘাত ঘটানোর পুরো ক্ষমতা থেকে যায়।"[২]

গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় ভুল রোগ নির্ণয়ে জলাতঙ্ককে অন্য রোগ বলে চালিয়েছেন গ্রামের হাতুড়ে বা ওঝারা। এই প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। বছরখানেক আগে প্রায় ষাট সত্তর বছর বয়সের এক রোগীকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে আনা হয়েছে, কিছু খেতে পারছেন না এমনকি জল পর্যন্ত না। জল দেখলেই কেমন আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন তিনি, ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করতে পারছেন না। পাখার বাতাস তো নয়ই এমনকি জরুরী বিভাগের ঘরের জানালা দরজা দিয়ে যে মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাতেই

সূত্র—১. C. R. TRIVEIDI—JIMA—Vol 76 April 81
২. JIMA Vol 81

কষ্ট হচ্ছে তাঁর। জানালা বন্ধ করতে করুণ আর্তি জানাচ্ছেন তিনি। তাঁর ভয়ার্ত মুখ ও অন্যান্য সব লক্ষণ দেখে বর্তমান লেখকের ধারণা হোল জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ধারণা বদ্ধমূল হোল যখন জানা গেল ঐ ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়ে ছিল এক বছর আগে এবং উনি কোন চিকিৎসার আশ্রয় নেননি। ওঁর উদ্বিগ্ন আত্মীয়-স্বজনকে বুঝিয়ে বলা হল সব কথা। বলা হোল এই রোগের কথা—তার পরিণতির কথা। বলা হোল কোলকাতার আই. ডি. হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ঐভাবে লিখেও দেওয়া হোল। ঘটনার একদিন পর জানা গেল ঐ রোগীকে কোলকাতার আই. ডি. হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি, নিয়ে যাওয়া হয়েছে রোগীর বাড়ীতে। এবং 'স্থানীয় ডাক্তারের' নির্দেশে 'রক্ত পরীক্ষা' করে স্থির হয়েছে এটি জলাতঙ্ক নয় অন্য রোগ। এই বিশ্বাসে আত্মীয় ও পাড়ার লোকেরা নাকি রোগ নির্ণয় সঠিক না করার জন্য ও রোগীর যদি জলাতঙ্ক হয় তবে মারা গেল না কেন—ইত্যাদির ব্যাপারে কৈফিয়ত চাইতে আসার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। যাই হোক প্রস্তুতি পর্ব কিঞ্চিৎ সময় নিয়ে নেয়, ইতিমধ্যে পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনে রোগী মারা যায়। ফলে লেখককে আর বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হোল না—রক্ষা পাওয়া গেল হয়তো আরও অনেক কিছু থেকে।

এই ঘটনার শুরু থেকেই অবহেলা—অবহেলা প্রতিষেধক না নেওয়া, উদাসীনতা, রোগীর চিকিৎসার শেষ চেষ্টা না করা এবং অজ্ঞতা গ্রামের হাতুড়ের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়া। যার বলি অভিমন্যু জানার মতো হাজারো অভিমন্যু। সবার পরিচিত মহাভারতের অভিমন্যু মাতৃগর্ভে থাকার সময়ই চক্রব্যূহে ঢোকার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু তার শেখা হয়নি ব্যূহ থেকে বেরোনোর কৌশল। মহাভারতের সপ্তরথী সহ সাত অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা অভিমন্যু হত্যার ব্যূহ রচনা করেছিল। আমার অভিমন্যুর সঙ্গে মহাকাব্যের অভিমন্যুর কি আশ্চর্য মিল! আজ যখন আমরা চাঁদে উপনিবেশ পড়ার স্বপ্নে বিভোর—আজ যখন আমরা আধুনিকতার রঙিন পতাকা উড়িয়ে গর্বিত পা ফেলে একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলেছি, তখনও অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের চক্রব্যূহে বন্দী রয়েছে আমাদের দেশের বহু মানুষ। যারা সপ্তরথীর মতো ওঝাদের অতিক্রম করতে জানে না। তাই আজও অসহায় উত্তরার কান্না থামানো গেল না।